একক ১ ❑ নারী নির্যাতন ও বৈষম্য

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ নারী নির্যাতন

১.৪ নারী নির্যাতনের প্রকার ও প্রকৃতি

১.৫ সারাংশ

১.৬ নারী বৈষম্য

১.৭ নারী বৈষম্য : সামাজিক ভিত্তি

১.৮ নারী বৈষম্য : প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি

১.৯ সমাধানের উপায় ও মূল্যায়ন (বিধিব্যবস্থা)

১.১০ সারাংশ

১.১১ প্রশ্নাবলী

১.১২ গ্রন্থপঞ্জী

১.১৩ পরিসংখ্যান

১.১ উদ্দেশ্য

সামাজিক পরিবর্তনের ফলে নানা ধরনের পরিকাঠামোগত এবং আন্তঃমানবিক সম্পর্কীয় সমস্যা দেখা দিয়েছে। আপনারা দেখতে পাবেন যে, এই মডিউলের সম্পূর্ণটাই বৃদ্ধ সমস্যা, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও পরিবেশ সমস্যা এবং নারী সমস্যাকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়েছে।

আলোচ্য এককে আমরা সাধারণভাবে নারীদের অবস্থা, বিশেষভাবে ভারতীয় নারীদের অবস্থা পর্যালোচনা করব। প্রভেদের দিক থেকে নারীদের পরিস্থিতি দেখতে গিয়ে আমরা বিশেষভাবে নারীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চাকরি ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রাখব। এছাড়া, নারীদের মর্যাদাগত পরিবর্তনশীল গতিপ্রকৃতি সম্পর্কেও এখানে আলোকপাতের চেষ্টা করব। এমনকি সামাজিক স্তর বিন্যাসের গঠনগত দিক থেকে সমাজের কাঠামো এবং প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা, পরিবার নামক প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া, পিতৃতন্ত্রের ধারাবাহিকতা, নারী বৈষম্যের ধারাবাহিকতাও এই সূত্রে দেখব। যে সমস্ত উৎপীড়নের সম্মুখীন নারীদের হতে হয়, যেমন, ধর্ষণ, যৌন উৎপীড়ন, অত্যাচার,

গৃহবিবাদ, অত্যাচার, গৃহবিবাদ, পণসংক্রান্ত মৃত্যু, বেশ্যাবৃত্তি, পর্ণোগ্রাফি ইত্যাদি, সেই বিষয়গুলির ওপরও আলোকপাত করা হবে। নারীদের বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রে রাজ্যের এবং সমাজের মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যুত্তরগুলি কীরূপ, তা এই এককে প্রকাশ্যে পর্যালোচনা করা হবে।

১.২ প্রস্তাবনা

আমাদের সমাজে নারীদের ওপর উৎপীড়ন এবং নারী বৈষম্যের বিষয়টি পর্যালোচনা করার আগে আমাদের প্রচলিত সমাজে লিঙ্গ বৈষম্যের ওপর সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণগুলি কিরূপ, সে সম্পর্কে একটু সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

সমাজতাত্ত্বিকগণ মূলতঃ যৌন চিহ্নিতকরণের চারটি প্রণালী বা উৎপাদনের মধ্য দিয়ে নারী এবং পুরুষের মধ্যে পার্থক্য বিচার করে থাকেন : (ক) জৈব জাগতিক দিক থেকে প্রাথমিক এবং যৌন শারীরিক প্রলক্ষণ (traits) গুলিকে প্রত্যক্ষ করে কোনো ব্যক্তিকে জৈবিক দিক থেকে পুরুষ এবং নারী হিসাবে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা। (খ) লিঙ্গ পরিচিতি অথবা যৌন সম্পর্কিত আত্ম-পরিচিতি। (গ) প্রচলিত সাংস্কৃতিক প্রত্যাশার ভিত্তিতে পুরুষ এবং নারীদের আচরণ, (ঘ) যৌন ভূমিকা, শ্রম বিভাজন, যৌনতা অনুসারে দায়িত্ব এবং কর্তব্য ইত্যাদি। যদিও সমাজের সাধারণ ধারণা হল, এগুলি পারস্পরিক ভাবে সংবদ্ধ থাকে, তা সত্ত্বেও প্রায়শই এরা একে অপরের বিরুদ্ধাচরণ করে।

লিঙ্গ চিহ্নিতকরণের বিষয়টি তিনটি প্রক্রিয়ার ওপরে নির্ভরশীল থাকে : (১) প্রতিরূপীকরণ (modelling), অথবা প্রাপ্তবয়স্কের আচরণের অনুকরণ, (২) পুনর্বলিয়ানকরণ (reinforcement), বা যে আচরণ শিশুদের লিঙ্গ অনুসারে যথাযথ তা উৎসাহিত করা এবং যে আচরণগুলি তাদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত নয়, তা নিবারণ করা। (৩) আত্ম-সামাজিকীকরণ, যা হল শিশুর সেই সকল আত্ম-পরিচিতির চর্চা করা, যেগুলি অপরের বাঞ্ছনীয় প্রতিক্রিয়া লাভ করবে।

সমাজ মূলত সামাজিক ভূমিকার পৃথকীকরণে যৌন বিষয়টি উল্লেখ করে থাকে। এটি কেবল জৈব জাগতিক দিক থেকেই পৃথক করা হয় না। যেমন, পুরুষের দীর্ঘ আয়তন এবং নারীর সন্তান ধারণ ক্ষমতা। নারী পুরুষের ভিন্নতার প্রকৃতি অসংখ্য, কিন্তু আমাদের যৌন ভূমিকায় প্রাকৃতিক শৃঙ্খলের তুলনায় প্রচলিত সমাজের সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক শক্তিগুলি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে সমাজতত্ত্বের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়টিকে বুঝতে গেলে তার অভিজ্ঞতামূলক এবং তত্ত্ববিষয়ক দিকগুলির ওপর বিশেষ নজর রাখতে হবে। অতএব লিঙ্গ সংক্রান্ত প্রশ্ন, মানবজাতি সম্বন্ধীয় বিষয়, যৌনতা এবং অক্ষমতার বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদের সংবেদনশীল হতে হবে। মারগারেট মীড (Margaret Mead, 1935) এ সম্পর্কে বলেন, প্রতিটি সংস্কৃতি জীবনধারার কতকগুলি দিককে গুরুত্ব দেয়, আবার কতকগুলি দিক বর্জন করে। যদিও প্রতিটি সংস্কৃতি পুরুষ এবং নারীর ভূমিকাকে কতকগুলি প্রাতিষ্ঠানিক পথ ধরে সুনির্দিষ্ট করে দেয়, তাই বলে পৃথকীকরণের ফলে পারস্পরিক বৈপরীত্য বা একের প্রতি অন্যের প্রভুত্ব বা দমনমূলক আচরণ সমর্থন করে না।

যৌন ভূমিকা পৃথকীকরণ বিভিন্ন ভাবে করা যেতে পারে। যৌন ভূমিকা সংক্রান্ত কার্যনির্বাহী তাত্ত্বিকরা এরূপ মনে করেন যে, আধুনিক পরিবার ব্যবস্থায় সহায়কের ভূমিকা পালনের জন্য একজনকে প্রয়োজন, যিনি পরিবার এবং বহির্জগতের সঙ্গে মধ্যস্থতা করেন। একজনকে পরিবারের অভ্যন্তরীণ কাজকর্মের দায়িত্ব নিতে হয়, যিনি পরিবারের মধ্যেকার সম্পর্কগুলি সুরক্ষিত করেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে স্ত্রীর সন্তান ধারণের ক্ষমতা তাকে পরিবারের অভ্যন্তরীণ দায়িত্বগুলি নিতে বাধ্য করে এবং স্বামীকে উপার্জনকারীর ভূমিকা পালন করতে হয়।

তুলনামূলকভাবে, দ্বন্দ্ববাদী তাত্ত্বিকরা মনে করেন যে, কর্তৃত্বকারী গোষ্ঠী পুরুষ এবং অনুসরণকারী গোষ্ঠী নারীদের

পারস্পরিক যৌন সংক্রান্ত অসমতাই পারস্পরিক দ্বন্দ্বের অন্যতম কারণ। তাঁরা একথাও মনে করেন যে, পুরুষদের কর্তৃত্ব স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই গড়ে ওঠে, কারণ পুরুষেরা আকৃতিতে নারীদের তুলনায় দীর্ঘ ও সবল। তাই যৌন তৃপ্তির উদ্দেশ্যে অনায়াসেই তারা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নারীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, কোনো নারী পুরুষের অনুগত হবে কিনা, তা নির্ভর করে—

(ক) স্ত্রীর যাবতীয় সম্পদকে নিয়ন্ত্রণ করে;

(খ) স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির প্রেক্ষিতে নারী কতখানি মূল্যবান।

নব্য মার্কস্‌বাদী তাত্ত্বিকদের মতে, দুটি পরস্পরবিরোধী লিঙ্গ সম্পর্ক হল, কর্তৃত্বকারী পুরুষদের সঙ্গে অধীনস্থ নারীদের সম্পর্ক। কিন্তু এই অসাম্যের ভিত্তি নিহিত ধনতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতে, যৌন সম্পর্কের মধ্যে নয়। তাই তাঁরা মনে করেন, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কতকগুলি জটিল সম্পর্ক গড়ে ওঠে ধনতন্ত্র, পিতৃতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে কেন্দ্র করে। এই ভাবেই ধনতন্ত্র বাজারে নমনীয়তা গড়ে তোলে।

নারীবাদী ঐতিহ্য অনুসারে পরিবর্তনকামী নারীবাদ ব্যক্তিগত অধিকার, সাম্য, ন্যায়বিচার এবং সকলের সমান সুযোগ-সুবিধা দানের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে। এই ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার দাবী করা থেকে নারীদের প্রতিরুদ্ধ করে সামাজিক কিছু বাধা। নারীদের এই অবনমিত অবস্থান কাটিয়ে উঠতে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট আইনগত এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। চরমপন্থী নারীবাদের মতাদর্শে নারীর ওপর পুরুষের সামাজিক কর্তৃত্ব পিতৃতন্ত্রের নানা যন্ত্রের দ্বারা চালিত হয়; যেমন অত্যাচার, যৌনতা/ইতররতি প্রবণতা (heterosexuality), নারীর সন্তান ধারণের ক্ষমতা প্রভৃতি। এই সকল ক্ষেত্রে পুরুষেরা গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে নারীদের ওপর উৎপীড়নের জন্য দায়ী।

দুটি সাধারণ তত্ত্ব—মনোপর্যালোচনা (Psychoanalysis) এবং আধুনিক কাঠামোতত্ত্ব (Post structuralism) ক্রমশ ভাষা, সংস্কৃতি এবং আলোচনার ওপর গুরুত্ব বৃদ্ধি করে তুলছে। এর ফলস্বরূপ নারীদের ক্ষেত্রে 'পৃথক' (difference) শব্দটি নানা অর্থ এবং মাত্রা পেয়েছে। 'পৃথক' অর্থে এখন আর কেবলমাত্র নারীদের অভিজ্ঞতার পার্থক্য বোঝানো হয় না, উত্তর-আধুনিকতা একই সাথে নারী ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত ভিন্নতার ওপর আলোকপাত করে। এই সকল তত্ত্ববিষয়ক আলোচনা নারী উৎপীড়নের উদ্দেশ্য হিসাবে যে কোনো একটি কারণকে স্বীকৃতি দেওয়ার রীতি বর্জন করে। যেমন, পুরুষের অত্যাচার অথবা প্রভেদকারী আইন। নারী এবং পুরুষের মতো এবং সম্পর্কসমূহ কতখানি সমরূপধর্মী, এই নিয়ে নানা যুক্তিতর্ক রয়েছে। আবার নারীদের অভিজ্ঞতা যে সর্বদাই নঞর্থক এবং পুরুষরাও যে সর্বদা বিরুদ্ধাচরণ করেন, সে কথাও ঠিক নয়।

সমাজতাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টির বিস্তারিত পর্যালোচনার পর আমরা লিঙ্গসম্পর্কিত বিষয়টির ওপর একটি ধারণা লাভ করতে পারি। কিন্তু নারী পুরুষের মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক ধারণা কেবলই কোনা তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয় নয়, এই ধারণা সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। এই বিভাগীয় বক্তব্যের শেষে আমরা লিঙ্গ বৈষম্যর ভিত্তি সম্পর্কীয় পর্যালোচনা করব।

লিঙ্গভিত্তিক ধারণাগুলি, যা নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে, তা সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত এবং প্রয়োজনের অধিক সরলীকৃত। এই অপরিবর্তনীয় ধারণাগুলি আমাদের পুরুষ ও নারীর কাটভিত্তিক পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত করে, এবং একই সঙ্গে তাদের পরম্পরাগত (traditional) ভূমিকা আমাদের মনে লিঙ্গভিত্তিক বিশ্বাসকে দৃঢ় করে। যদিও পরম্পরাগত লিঙ্গভিত্তিক ধারণাগুলির আরোপিত সীমাবদ্ধতা নিয়ে উভয় লিঙ্গেরই অভিযোগ রয়েছে, তবু সেগুলি প্রচলিত ও সচল। আজও পুরুষরাই কাজের খোঁজে বাইরে যান, আর নারীরা সন্তান প্রতিপালনসহ পরিবারের যাবতীয় দায় দায়িত্ব পালন করেন। এই লিঙ্গ বৈষম্যের প্রেক্ষিতে আজও লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, নারী এবং পুরুষের লিঙ্গ সংক্রান্ত ভূমিকা সাম্যহীন। আবার লিঙ্গ বৈষম্যের নিরিখে নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব ও লাঞ্ছনা এখনও বর্তমান, যদিও আজকের সমাজে নারীরা অপেক্ষাকৃতভাবে পুরুষদের সাথে অনেক বেশি সমতা (equality) ভোগ করেন।

১.৩ নারী নির্যাতন

উপরোক্ত অংশের পর্যালোচনায় আমরা নারী-পুরুষের সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ করেছি। যেখানে নারীদের ওপর উৎপীড়ন এবং প্রভেদের বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, এই উৎপীড়ন ও প্রভেদের অন্যতম কারণ হল, পুরুষদের ক্ষমতা ও মর্যাদাগত দিক থেকে শীর্ষে থাকার ভ্রান্ত প্রবণতা, যার ভিত্তি হল যৌন পার্থক্য এবং লিঙ্গভিত্তিক তথাকথিত ধারণা।

সাধারণত এরূপ ব্যাখ্যা করা হয় যে, নারীদের ওপর পুরুষদের অত্যাচার কিছু অসুস্থ অথবা মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে হতবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরই কাজ। এমনকি এইসব পুরুষেরা নারীদের দ্বারা সাধারণত প্রলুব্ধ হয় বা তাদের উত্তেজিত আচরণ দ্বারা আকৃষ্ট হয়। এমনও মনে করা হত যে, পুরুষদের নারীদের প্রতি অত্যাচারের ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্ন, যেগুলির কর্তা গৃহের বাইরে যে কোনো অপরিচিত ব্যক্তি। এমনকি নারীদের উপর প্রতিনিয়ত যে অত্যাচার হয়, তার সঠিক পরিসংখ্যানগত বিবরণ কোথাও নেই। এর কারণ, আজও বহু নারী পুলিশের কাছে তাদের ওপর অত্যাচারের বিবরণ দেন না কারণ বহু সময় অত্যাচারী তাদের পরিচিতি। এমনকি অনেক সময় ঘটনার তদারকি করতে পুলিশ বিমুখ ও অনিচ্ছুক থাকে, কারণ সেগুলি একান্ত পারিবারিক। যদিও স্ত্রীদের ওপর যৌন উৎপীড়নকে আজকের সমাজও সঠিক গুরুত্ব দেয় না, কিন্তু এর দ্বারা নারীর জীবনে লিঙ্গ বৈষম্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ, জটিল এবং সদা বর্তমান সমস্যাকে চিহ্নিত করা যায়।

যৌন উৎপীড়ন সরাসরি নারীদের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে, কারণ সামাজিক দিক থেকে নারীদের দেহকে যৌনতার অর্থেই ব্যবহার করা হয়। নারীদের ওপর যৌন সংক্রান্ত উৎপীড়নের মাধ্যম হল, হুমকি, অথবা শারীরিক দিক থেকে বিপর্যস্ত করা, যা নারীর শারীরিক ভাবে ঘনিষ্ঠ হওয়া ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

যৌন উৎপীড়নের মধ্য দিয়ে পুরুষেরা কেবল ভয় দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে, অথবা বল প্রয়োগের মাধ্যমে নারীদের শরীরকে ব্যবহার করে তাই নয়, এমনকি আবেগের দিক থেকে তাদের যন্ত্রণা দেয় এবং আঘাত করে। এগুলি হল যৌন ধর্ষণ, যৌন অত্যাচার, যৌনাঙ্গের ক্ষয়ক্ষতি, শরীরে আঘাত, যৌন-লাঞ্ছনা, শিশুর যৌন নির্যাতন এবং পর্নগ্রাফি। নারী এবং যুবরীতর ওপর উৎপীড়নের এই মাধ্যমগুলি দেখলে বোঝা যায় যে পুরুষেরা যৌনতাকে ব্যবহার করে নিজেদের ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের অস্ত্র হিসাবে, যার মাধ্যমে তারা নারীর স্বাধীনতাকে খর্বকরে তাদের জীবনের পরিধিকে সংকুচিত করতে চায়। অতএব যে ভাবেই হোক, তারা নারীদের বাধ্য করে সুনির্দিষ্ট কিছু ব্যবহার এবং নিয়মের মধ্যে বন্দী থাকতে। অন্যভাবে বলা যায় যে, বাস্তব পরিস্থিতি এবং বলপ্রয়োগের হুমকি, এই দুটিই লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

১.৪ নারী নির্যাতনের প্রকার ও প্রকৃতি

বিগত অংশে আপনারা নিশ্চয়ই আলোচনার মুখ্য বিষয় অনুধাবনের সচেষ্ট হয়েছেন। সেই সঙ্গে আমরা সমাজতত্ত্বের শিক্ষার্থী হিসাবে কোন দিক থেকে এই বিষয়ের আলোচনা করব, তাও বুঝেছি। আসুন, আমরা এই অংশে নারীদের ওপর উৎপীড়নের ধরন বা প্রকৃতি সম্পর্কে একটু পর্যালোচনা করি।

ব্যুরো অফ্ পুলিশ রিসার্চ এ্যান্ড ডেভেলপ্‌মেন্ট ইন ইন্ডিয়া (Bureau of Police Research and Development in India) নারীদের ওপর উৎপীড়নজনিত অপরাধকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন—

(১) ইন্ডিয়ান পিনাল কোডের (Indian Penal Code) অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত অপরাধ—ধর্ষণ, অপহরণ বা বলপূর্বক অপহরণ, পণ সংক্রান্ত হত্যা, শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার, রোমিওবৃত্তি (eye-teasing) এবং একুশ বছরের অন্তর্বর্তী যুবতীদের পাচার করা।

(২) স্থানীয় বা বিশেষ আইন অন্তর্ভুল অপরাধ : সতীপ্রথা, পণপ্রথা (dowry prohibition), নারীর দেহ ব্যবসা (immoral traffic), নারী দেহের অশালীন পরিবেশন (indecent representation of women).

নারীদের বিরুদ্ধে অনেক সময় অত্যাচারের উৎস সামাজিক বিশ্বাস ও মতবাদ থেকে হয় যেগুলি নারীর স্বাধীন সত্তা ও মর্যাদার অবনমন ঘটায়। নারীদের বিরুদ্ধে অত্যাচার ও নির্যাতনকে সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে নিম্ন উপায়ে বলা যেতে পারে—

(১) অপরাধমূলক অত্যাচার : ধর্ষণ, প্রতারণা, খুন, উৎপীড়ন, পাচার, পর্ণোগ্রাফি ইত্যাদি।

(২) পারিবারিক উৎপীড়ন : বধূ নির্যাতন, পণ সংক্রান্ত মৃত্যু, যৌন উৎপীড়ন এবং বঞ্চনা (deprivation)।

(৩) সামাজিক অত্যাচার : বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ভ্রূণহত্যা, প্রাপ্য সম্পত্তি থেকে নারীকে বঞ্চিত করা, সতীদাহকে সমর্থন করা এবং বলপূর্বক তা প্রচলন করা, পণ সংক্রান্ত অত্যাচার, কর্মক্ষেত্রে যৌন উৎপীড়ন ইত্যাদি।

এখন আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করব সেই সকল নারী উৎপীড়নের দিকে, যা সমাজের সকল স্তরে বিস্তৃত ও ব্যাপ্ত।

(ক) ধর্ষণ, যৌন লাঞ্ছনা এবং উৎপীড়ন

ধর্ষণ, যৌন লাঞ্ছনা, নারীদের ওপর রোমিওবৃত্তি (eve-teasing), উৎপীড়ন এবং নির্যাতনের সাহায্যে পুরুষতন্ত্র মূলত নারীদের স্বাধীনতাকে খর্ব করতে চায়। একই সঙ্গে এই বিশ্বাসকেও দৃঢ় করতে যায় যে, জীবনে নারীদের চলার পথে পুরুষের ওপর নির্ভরতা অবশ্যম্ভাবী। যৌন লাঞ্ছনা এবং অত্যাচার যখন কর্মক্ষেত্রে ঘটে, সেক্ষেত্রে চাকরি হারানোর এবং সমাজে কলঙ্কিত হওয়ার ভীতিতে নারীরা সে সকল ঘটনাগুলি গোপন করেন। যৌন লাঞ্ছনা পুরুষের নানাবিধ আচরণের মধ্যে প্রকাশ পায়, যার কিছুটা শরীর সম্পর্কীয়, কিছুটা মৌখিক, আবার কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক। যেমন, কুমন্তব্য বা অশালীনভাবে মহিলাদের দিকে তাকানো, ঠাট্টা করা, অকারণ স্পর্শ করা বা সরাসরি যৌন সংসর্গের প্রস্তাব দান। বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ এবং যৌন উৎপীড়নের মধ্যে মূলত পার্থক্য এই যে, যৌন উৎপীড়ন কখনোই দুজনের সম্মতিপূর্বক নয়, উপরন্তু বিরক্তি এবং ভীতি উদ্রেককারী। ফলস্বরূপ মহিলারা বাধ্য হন, কার্যক্ষেত্র পরিবর্তন করতে। নারীদের পোষাক কখনোই তাদের শ্লীলতাহানি অথবা যৌন উৎপীড়নের কারণ হতে পারে না।

ধর্ষণ হল একটি উগ্র যৌন সংসর্গ, যা কোনো নারীর ওপর তার ইচ্ছা এবং মতামতের বিরুদ্ধে সম্পাদিত হয়। ধর্ষণ হল নারী-পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্ককে প্রদর্শন করে। এর দ্বারা নারীর অস্তিত্ব এবং ব্যক্তিত্ব অস্বীকার করা হয় এবং নারীকে একটি বস্তুতে পরিণত করা হয়। এর পাশাপাশি ধর্ষিতা নারী প্রচলিত সমাজে স্বতন্ত্র ভাবে চিহ্নিত এবং অবহেলিত হয়ে থাকেন, যার ফলে নারী এক চরম ব্যক্তিত্বহীনতা ও অপরাধবোধের শিকার হয়। আজও মুষ্টিমেয় ক্ষেত্র ছাড়া অধিকাংশ ধর্ষণের কারণ যৌন বিকৃতি নয়। যা ভয়াবহ তা হল, এই ধরনের অসামাজিক ধর্ষণের ঘটনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতি দুঘণ্টায় ভারতবর্ষের কোথাও না কোথাও একটি করে ধর্ষণজনিত ঘটনা ঘটছে। আরও লজ্জাজনক বিষয় হল, ধর্ষিতাদের অধিকাংশই বারো বছরের অনূর্ধ্বা। এদের দুই তৃতীয়াংশ ষোল বছরের থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে অবস্থান করে। এদের সকলে কেবল দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত নয়, মধ্যবিত্ত মহিলারাও এর অন্তর্ভুক্ত, যাদের পুরুষ কর্মচারী দ্বারা যৌনগত দিক থেকে উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়। জেলখানায় অবরুদ্ধ মহিলা অপরাধীরা পুরুষ কর্মচারীদের কাছে, হাসপাতালে মহিলা রোগীরা কর্মীবৃন্দের হাতে, পরিচারিকারা তাদের গৃহকর্তার কাছে এবং রোজ উপার্জনকারী মহিলারা মহাজন ও দালালদের হাতে ধর্ষিতা হন। এমনকি যারা বোবা, কালা, বিকারগ্রস্ত, অন্ধ এবং দরিদ্র, তারাও নিস্কৃতি পায় না।

প্রকৃতপক্ষে ধর্ষণ বিভিন্ন ভাবে সম্পাদিত হয়ে থাকে—(অ) পরিবারের অভ্যন্তরে (উদাহরণস্বরূপ স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ সংগম, শিশুদের ওপর যৌন উৎপীড়ন, স্বামীর দ্বারা ধর্ষণ, যা আইনের চোখে স্বীকৃত নয়)।

(আ) জাতি ও শ্রেণীগত আধিপত্য বজায় রাখার জন্য যে ধর্ষণ (উদাহরণস্বরূপ, উঁচু জাতির কোনো পুরুষ দ্বারা নীচুজাতির কোনো নারীর ওপর যে ধর্ষণ, ভূমিহীন বেগার শ্রমিকদের (bonded labour) ওপর ভূস্বামীর দ্বারা ধর্ষণ।

(ই) শিশু, অপ্রাপ্তবয়স্কা এবং অরক্ষিত নারীদের ওপর যে ধর্ষণ।

(ঈ) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, যুদ্ধ বা রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে কোনো সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী দ্বারা মিলিত ভাবে যে ধর্ষণ।

(উ) পুলিশি হেফাজতে (custody), হোমে (remand home), হাসপাতালে, কর্মক্ষেত্রে যে ধর্ষণ।

(ঊ) কোনোরকম পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া বিচ্ছিন্ন কোনো ধর্ষণ।

যে সকল নারীরা ধর্ষণের শিকার, তারা এই নিপীড়নের প্রভাব তিনটি স্তরে অনুভব করেন—মনস্তাত্ত্বিক, শারীরিক ও সামাজিক।

মনস্তত্ত্বের দিক থেকে ধর্ষণের প্রভাব তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করা যায়—ধর্ষণের পূর্বে, ধর্ষণের সময় এবং ধর্ষণের পরে। ধর্ষিত হওয়ার ভীতি নারীদের মধ্যে বর্তমান সবসময়, সব জায়গায়, যা বয়স, স্বাস্থ্য, চেহারা, মানসিক অবস্থান এবং আশ্রয় নিরপেক্ষ। অতএব ধর্ষণ ক্রিয়া বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বেই নারীরা একটি মানসিক চাপের মধ্যে থাকেন, যা তাদের স্বাধীনতাকে রুদ্ধ করে। বাস্তবিক অর্থে ধর্ষণ সমকালীন পরিস্থিতি হল এমন একটি মানসিক চাপ এবং কষ্টকর পরিস্থিতি, যেখানে থাকে অস্তিত্বের এক তীব্র সংকট। ধর্ষণের পরবর্তীকালে নারীরা বিচারব্যবস্থায় চরম অমানবিকতার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। সামাজিক ভাবে লাঞ্ছিত রূপে চিহ্নিত হন, শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করেন প্রভৃতি। এগুলির সমন্বয়ে নারীর মনে গড়ে ওঠে এক অবিশ্বাস, যা তার মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাকে ব্যবহার করে।

ধর্ষণ রোধের ক্ষীণ চেষ্টার ফলে নারীরা নানাভাবে শারীরিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হন, যা নির্ভর করে আঘাতের অবস্থান এবং প্রতিরোধের মাত্রার ওপর। ধর্ষণ সম্পর্কিত আঘাতগুলি মূলত ঘাড়ে, গালে, চিবুকে, উরু, বাহু, পায়ে, মেনকি যৌনাঙ্গভিত্তিক হয়ে থাকে, যা নানা শারীরিক সমস্যায় পরিণত হয়। এই সকল ক্ষেত্রে হাসপাতালগুলি থেকে যথাযথ শুশ্রুষা এবং সহানুভূতি পাওয়া যায় না এবং তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার সমস্ত ব্যয় নারীদের নিজেদের বহন করতে হয়। এই সব রোগিনীদের জন্য চিকিৎসার কোনো বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া, এদের মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে সহায়তাদানের জন্য পরিকাঠামোগত কোনো ব্যবস্থাও নেই, যা ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদের মানসিক ভাবে পরিচালনা করতে পারে।

ধর্ষণের ফলে ধর্ষিতা এবং সমাজ উভয়ের উপরই একটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তরা বিবাহিত বা অবিবাহিত, শিশু, প্রাপ্তবয়সক অথবা বৃদ্ধ, যেই হোক না কেন, ধর্ষণের প্রভাব প্রত্যেকের ওপর ভিন্ন। যদি তিনি অবিবাহিতা হন, সেক্ষেত্রে তার আগামী দিনের বিবাহিত জীবনের সম্ভাবনা মুছে যেতে পারে। অপরদিকে বিবাহিতাদের ক্ষেত্রে, এই ঘটনার পর বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ধর্ষিতার বয়স অনুযায়ী তার শারীরিক যন্ত্রণা এবং মানসিক দুর্বলতার ধরন এক এক প্রকার হতে পারে। যদি ধর্ষণের মধ্য দিয়ে তার প্রথম যৌনতাভিত্তিক অভিজ্ঞতা (sexual experience) সঞ্চিত হয়, সেক্ষেত্রে ধর্ষিতার যৌন বোধ, সাধারণ জীবনধারা, অত্যাচার, অপমানের ধারণাগুলি বিকৃত হয়। এই ধর্ষণ স্থায়ীভাবে অপকৃত ব্যক্তিকে বিশ্বাসহীনতা এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভোগায়, যার ফলে ধর্ষিতার স্বাধীন জীবনযাপন বিঘ্নিত হয়। তাই একাকী জীবনধারণের দিকেও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ধর্ষিতা নারী, যিনি সমাজের একটি কার্যনির্বাহী একক রূপে অবস্থান করেন, তিনি কর্মরতা বা মা, অথবা কন্যা, কিংবা স্ত্রী বা যতই সৃষ্টিশীল হোন না কেন, তার মানসিক স্থিতিশীলতা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক মাত্রায় থাকে। সামাজিক স্তরে ধর্ষণ পিতৃতন্ত্র, পুরুষের আধিপত্য, নারীর শোষণ এবং নারীর মর্যাদার অবনমনের চিত্র তুলে ধরে। আশ্চর্যজনকভাবে

ধর্ষণের পরবর্তীকালে সমাজের চোখে ধর্ষিতা এবং তার পরিবার লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হয়। এমনকি প্রতিবেশী এবং তথাকথিত বন্ধুগোষ্ঠী এই অবস্থার চর্চা করে এবং গুজব ছড়িয়ে মজা পায়। এইরকম ক্ষেত্রে আমাদের তথাকথিত সভ্য সমাজের সহযোগী মাধ্যমগুলি যেমন পুলিশ, বিচারব্যবস্থা বা চিকিৎসা কর্মী বা গণমাধ্যম, সংবেদনশীলতার অভাবে ক্ষতিগ্রস্তের সাথে যে আচরণ করে থাকে, তা নেহাতই যান্ত্রিক। ফলে ধর্ষিতারা নীতিগত দিক থেকে জনগণ এবং সহযোগী মাধ্যমের কাছে নিরপেক্ষ বিচারের নামে দুর্নাম, লাঞ্ছনা এবং অত্যাচারের শিকার হয়।

(খ) পারিবারিক অত্যাচার বা নির্যাতন এবং পণ সংক্রান্ত মৃত্যু :

পরিবারের অভ্যন্তরে নারীদের ওপর যে ধরনের নির্যাতন হয়, যেমন, দুর্ব্যবহার, মারধোর, মানসিক অত্যাচার ইত্যাদি, যেগুলিকে পারিবারিক বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয়, কিন্তু কখনোই অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় না। এরূপ দেখা গেছে যে, পারিবারিক নির্যাতন সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যেই অবস্থান করে। এছাড়া, এই বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, বিবাহের প্রথম কয়েক বছরের মধ্যে, স্ত্রীদের মৃত্যুর হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সাধারণত পণসংক্রান্ত মৃত্যু হিসাবে জানা যায়। গৃহ সংক্রান্ত অত্যাচার বলতে আমরা এমন কিছু আচরণের কতা বুঝি যার দ্বারা নারীর ওপর তার জীবনসঙ্গী ক্ষতিকর শারীরিক অত্যাচার করে। পরবর্তীকালে গবেষণার মাধ্যমে এই সংজ্ঞার বিস্তার ঘটে, যার ফলে অপব্যবহার, বৈবাহিক জীবনের ধর্ষণ (marital rape) অথবা আবেগগত এবং মানসিক উৎপীড়ন এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়। অপরদিকে নারীবাদী চিন্তাধারার অনুগামীরা এই সমস্যাকে নারীর ওপর তার জীবনসঙ্গীর বলপূর্বক নিয়ন্ত্রণ হিসাবে দেখে, যা কিনা শারীরিক, মানসিক বা যৌন সংক্রান্ত হতে পারে।

আরও লক্ষ্য করা গেছে যে, পণ সংক্রান্ত মৃত্যু ও অত্যাচারের মুখ্য কারণ হল, যেখানে নারী স্বল্প পণ আনেন, কিংবা আদৌ কোনো পণ আনতে সক্ষম হন না। সেই নারীই তখন তার নিকট আত্মীয়-পরিজনের দ্বারা নির্যাতিত হন। এই নির্যাতনের মূল কারণ হল লোভ, যার কবলে পড়ে তারা নানা প্রকারে নারীর ওপর অত্যাচার করে। তার মাধ্যমে অধিক পণ আদায় করতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই লোভ নারীর মৃত্যুর কারণ হয়, যা কিনা পরবর্তীকালে পুরুষকে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে আবার পণ সংগ্রহ করার সুযোগ করে দেয়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হল যে, এই ধরনের ঘটনাগুলি সহজেই প্রতিরোধ করা যেত, যদি পিতা-মাতা অথবা আত্মীয়-স্বজন তাদের পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ বর্জন করে তাদের কন্যাকে পুনরায় গ্রহণ করে নিত। উপরন্তু বিবাহ ভেঙে গেলে একটি মেয়ে এবং তার পরিবারকে সামাজিক চাপের সম্মুখীন হতে হয় এবং সেই মেয়েটি তার পরিবারের কাছে অর্থনৈতিক দিক থেকে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

পণপ্রথার অস্তিত্ব, প্রচলন এবং বিস্তার যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। পণ সংক্রান্ত মৃত্যু ক্রমশঃ ছোটো-বড়ো গ্রামে ও শহরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই মৃত্যুর ঘটনাগুলি মহিলা গোষ্ঠীর (women's group) দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যার ফলে ১৯৮০ সালের প্রথমার্ধে তারা পণ সংক্রান্ত আইন (dowry act) সংশোধনের দাবি পেশ করেন। আরও লক্ষ্য করা যায় যে, আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে (Amniocentesis test) নিয়ে মূলত উত্তর এবং পশ্চিম ভারতে নিয়মিত ভাবে শিশুর জন্মের পূর্বে তার লিঙ্গ নির্ধারণ করে ভ্রূণহত্যা করা হয়, যাতে পরবর্তীকালে পণজনিত সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয়।

এমনও দেখা গেছে যে, প্রতিলোম (hypergamy) বিবাহের মাধ্যমে (নীচু জাতের নারী উঁচু জাতের পুরুষ) পণপ্রথার প্রচলন হয়। 'স্ত্রীধন' সংক্রান্ত ধারণার মাধ্যমে বিবাহকালীন সম্পদ বা সম্পত্তি প্রদানের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল যা ধীরে ধীরে পাত্রীপক্ষের দ্বারা পাত্রপক্ষকে দেওয়া পণপ্রথায় রূপান্তরিত হয়। এই পণের ধরন যা কিনা সাধারণতঃ অস্থাবর সম্পত্তি হওয়া উচিত, তা পরবর্তীকালে স্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত হয়, যার ওপরে বিবাহিতা মহিলার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। উপভোগবাদের (Consumerism) ফলে নানারকম বৈদ্যুতিক সামগ্রী, আসবাব, যানবাহন ইত্যাদি

সাধারণ মধ্যবিত্তের মধ্যে পণের আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে তুলেছে। এই পণপ্রথা সাম্প্রতিককালে নিম্ন শ্রেণী ও অহিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রচলিত হয়েছে, যদিও পূর্বে এই সকল শ্রেণীর মধ্যে এই প্রথার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। পণপ্রথা সম্পর্কে বর্তমানে যে ধারণা প্রচলিত তা হল, পাত্রপক্ষের পরিবারকে একটি মেয়ের দায়-দায়িত্ব এবং নিরাপত্তার ভার বহন করার জন্য পণ দেওয়া হয় দায়ভার হিসেবে। এই প্রচলিত ধারণার ভিত্তি হল যে নারী উৎপাদনশীল নন, বরং একটি ভারগ্রস্ত বোঝা, যা স্থানান্তরিত হয় পাত্রের পরিবারে। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কারণ; (ক) তা নারীর বাইরে এবং অভ্যন্তরীণ জীবনের ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করে, এবং (খ) চাকুরিরতা নারী কেন পণ দিতে বাধ্য হন, তার কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

এই চালচিত্রের পরিবর্তন তখনই সম্ভব যখন নারীকে আর উৎপাদনশীল, ব্যয়শীল সামগ্রী হিসাবে দেখা হবে না। সম্প্রদায়, প্রতিবেশী এবং নিজের বাবা-মায়ের কাছ থেকে নারীর প্রয়োজন অধিক মাত্রায় সহযোগিতা। এমনকি একটি মেয়ের যে কোনো প্রকারে বিবাহের ওপর সমাজ এবং তার বাবা-মা যে অসামান্য গুরুত্ব দেয় এবং চাপ সৃষ্টি করে থাকে, সেই বিষয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত। স্বতন্ত্র এবং অবিবাহিতা থাকার যে স্বাধীনতা, তার যথাযথ সম্মান এবং মূল্য দেওয়া উচিত। একক নারী যিনি স্বতন্ত্র জীবনযাপন করেন কিংবা বাবা মায়ের সঙ্গে বাস করেন, তাকে নিয়মের বিচ্যুতি হিসেবে না দেখে নিয়মের একটি ধারা হিসেবে দেখতে হবে।

গৃহ সংক্রান্ত নির্যাতনের আর একটি দিক হল বিধবাদের ওপর অত্যাচার, যা সমাজের নারীর মর্যাদাহানির একটি বিশেষ কারণ রূপে গণ্য করা যায়। বিধবাদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, অবহেলা, বাচনিক কটু ভাষা, যৌন সংক্রান্ত অত্যাচার ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার মতো নানা অত্যাচার প্রচলিত আছে। সাধারণত অল্পবয়সী বিধবারা যৌন লাঞ্ছনা, অপমান এবং শোষণের মতো নানবিধ নির্যাতনের শিকার হন, অন্যান্য বয়সের বিধবাদের চেয়ে অধিক মাত্রায়। ক্ষমতা, সম্পত্তি এবং যৌনতা—এই তিনটি হল বিধবা নিযআতনের মূল কারণ। পরিবারে অবস্থিত পুরুষেরাই হলেন এই অত্যাচারের মূল প্রবক্তা। পরিবারের আয়তন, আকৃতি, এমনকি অবস্থার নির্বিচারে বিধবাদেরই একমাত্র এই দুঃখজনক পরিস্থিতি সহ্য করতে হয়। সামাজিক নীতি এবং তার পরিচালনার ধরন অনুযায়ী বেশির ভাগ বিধবাই তার স্বামীর ব্যবসা, সঞ্চিত ধন এবং সম্পত্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকেন, যে কারণে পরিবারের অন্যান্য সদস্য নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থে তাদের অত্যন্ত সহজেই ব্যবহার করে। একমাত্র বয়স, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক অবস্থানই বিধবাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে এক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হতে পারে।

(গ) পতিতালয় :

পতিতালয় নারীর মর্যাদা এবং সম্মান ক্ষুণ্ণ করে এবং সমাজের চোখে সে নষ্ট নারীতে পরিণত হয়। নারীর যৌনতার সামগ্রীকরণের প্রারম্ভ হয় তার যৌনতার দাসত্ব এবং বশীভূতকরণের মাধ্যমে। নগরাঞ্চল, যেখানে একক পুরুষ গ্রামাঞ্চল থেকে দেশান্তরিত হয়ে আসে, সেখানে পতিতালয় অনিয়ন্ত্রিত এবং অত্যন্ত প্রচলিত। এই সব ক্ষেত্রে পতিতালয় সমস্যা একটি পরিস্থিতিগত আবশ্যিকতা। দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিগত আবশ্যিকতা হল—(১) সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, (২) দারিদ্র্য। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে সেই সব নারী অবস্থান করে যারা সমাজ কর্তৃক বহিষ্কৃত, যেমন, বিধবা, নিঃস্ব, পরিত্যক্তা এবং যারা প্রতারণা ও চতুরতার শিকার। যে সব মহিলারা ধর্ষণের পর পরিবার কর্তৃক বহিষ্কৃত, তারাও এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। নানাবিধ আইন মাধ্যম, যেমন ইম্‌মরাল ট্রাফিক ইন পারসনস্ প্রিভেনসান অ্যাক্ট (Immoral Traffic in Persons Prevention Act) যদিও প্রচলিত রয়েছে, তবুও এগুলি যৌনকর্মীদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করলেও উপভোক্তাদের (clients) অত্যন্ত লঘু শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেয়। উপরন্তু কার্যপ্রণয়ন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় না করে অপরাধের দণ্ড নির্ধারণ করার যুক্তি বা অর্থ কোনোটাই নেই। পতিতালয়ের পরিচালনা, রাজনীতিজ্ঞ এবং পুলিশের মধ্যে যে সম্বন্ধ এবং চক্রান্ত বর্তমান, তা দণ্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। উপযুক্ত প্রমাণের অভাব, বিচারালয়ের লিঙ্গভিত্তিক প্রতিরোধ এবং অপর্যাপ্ত কাঠামো এই প্রান্তিক (marginalised)

নারীদের সমাজের মূল স্রোতে আনার বিপক্ষে। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে রক্তমাংসের দেহ নিয়ে ব্যবসা চলে আসছে মানব সভ্যতার প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে। কিন্তু মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎকে সর্বনাশ ও নিয়তির পথে ঠেলে দিয়েছে এই ব্যবসা। বেশির ভাগ মহিলা যারা এই ব্যবসায় যুক্ত, তারা হল যৌন সংক্রান্ত ব্যাধি বা রোগের সূত্র, যেগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হল এডস্ (Aids)। অনুমোদনকারী সমাজ এবং তার উদার মনোভাব এই যৌন ব্যবসাকে সমাজের প্রতিটি কোণে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে 'আমি তোমার চেয়ে পবিত্র (holier than thou)'—এই ধারণাসম্পন্ন হয়ে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পরিবর্তে যৌন কর্মীদেরই এড্স রোগের সংক্রামক হিসাবে চিহ্নিত করি।

(ঘ) যৌন উত্তেজনা বর্ধক নারীকেই প্রদর্শন (Pornography)

পর্ণোগ্রাফি নারীদের ওপর এক ধরনের অত্যাচার। এটি সমাজে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত, যা কিনা সংস্কৃতির সব দিকগুলিকেও বিকৃত করেছে। এর উৎপত্তি পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা থেকে। পর্ণোগ্রাফি নারীর দেহকে পুরুষের অধিকৃত সামগ্রী হিসাবে চিত্রায়ণ করে এবং নারীর যৌনতাকে বস্তুগত, অশ্লীল ও অপমানজনক রূপে প্রদর্শন করে। পর্ণোগ্রাফি মধ্যেই রয়েছে নারী শোষণের ভিত্তি, কারণ এটি নারীকে পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট হিসেবে দেখে এবং নারীর সাথে অপব্যবহার করাকে উৎসাহ দেয়। এমনকি পর্ণোগ্রাফি সাহিত্য, ম্যাগাজিন, হোর্ডিং, ছবি এবং চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত হয়। বলা যায় তা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার (right to freedom of expression) নামে আসলে নারীর মর্যাদার অবমাননা করে। এর ফলস্বরূপ একদিকে যেমন পুরুষতান্ত্রিক প্রতিমূর্তি হিসাবে শক্তিশালী, আক্রমণপ্রবণ, তীব্র, দাম্ভিক পুরুষের জন্ম হয়, অন্যদিকে জন্ম নেয় বিনীত, বাধ্য এবং সহনশীল নারী, যাদের যৌন সামগ্রী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। বাস্তবে এই প্রতিচ্ছবিগুলি বাণিজ্যিক লাভের জন্য ব্যবহার করা হয়।

(ঙ) জাতিগোষ্ঠী :

জাতিগত মর্যাদায় দুর্বল নারীরা নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। উচ্চ নেতৃত্বকারী জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলে এই সকল দুর্বল নারীরা বেশি করে একাকীত্ব বোধ করেন। নেতৃত্বকারী এবং দুর্বল জাতিগোষ্ঠীর মানসিকতার পার্থক্য নারীদের মধ্যে অনেকখানি। কারণ, অধিকাংশ তথ্য এবং গবেষণা সংখ্যাগুরু গোষ্ঠী এবং তাদের অভিজ্ঞতার ওপরই দৃষ্টিপাত করে। গবেষকরা দেখিয়েছেন যে, জাতিগোষ্ঠীগত অবস্থান এবং হীনম্মন্যতার কারণে দুর্বল সংখ্যালঘু জাতির নারীরা আইনী মাধ্যমগুলি থেকে সাহায্য নিতে বিমুখ থাকে, এমনকি যখন জীবননাশের চরম হুমকি কিংবা অন্যান্য ভয়ঙ্কর অপরাধও তাদের ওপর এসে পড়ে। প্রমাণস্বরূপ দেখা গেছে যে, এই সমস্ত মাধ্যমগুলি কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকলেও আইন পরিচালনা করা থেকে বিরত থাকে, এমনকি এক এক সময় তারা নিজেরাই অপরাধে লিপ্ত থাকে।

১.৫ সারাংশ

এই পর্যন্ত আমরা পর্যালোচনা করেছি, আমাদের সমাজে নারীর মর্যাদা কতখানি এবং জানতে পেরেছি যে নানাবিধ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য নির্দেশকগুলিও আমাদের সমাজে নারীর শোষণের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। এই শোষণের ধরন অনুযায়ী সমাজে প্রতিটি শ্রেণীর মহিলাদেরই নির্যাতন সহ্য করতে হয়। নারীর ওপর যৌন অত্যাচার অত্যন্ত জটিল এবং আমাদের সমাজে লিঙ্গ বৈষম্যের একটি সদা বর্তমান বৈশিষ্ট্য। 'উৎপীড়ন' বলতে আমরা যা বুঝি তা হল এমন একটি পদ্ধতি, যা নারীকে কয়েকটি বিশেষ ধরনের আচরণ করতে বাধ্য করে বা রুদ্ধ করে। পূর্ববর্তী অংশে আমরা নারী নির্যাতনের নানা ধরন, যেমন ধর্ষণ, যৌন উৎপীড়ন, পারিবারিক অত্যাচার,

পতিতালয়, পর্ণোগ্রাফি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছি। আলোচনার মধ্যে আমরা এই নির্যাতনগুলির নানাপ্রকার কারণ, প্রকৃতি এবং প্রভাব বিশ্লেষণ করেছি। এই পর্যালোচনার মাধ্যমে নারীদের যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তা সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পেরেছি। এখন আমরা সমাজে নারীদের বৈষম্যকরণের দিকে দৃষ্টিপাত করব।

১.৬ নারী বৈষম্য

যেখানে যৌনতা স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে জৈবিক ও শারীরিক পার্থক্য নির্দেশ করে, সেখানে লিঙ্গ অর্থে স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গের সামাজিক নির্মাণকে বোঝায়। বস্তুত লিঙ্গকে কখনোই যৌনতার ভিত্তিতে বোঝা উচিত নয়, কারণ তার মধ্যে কোনো জৈবিক বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। লিঙ্গ ও লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা, ব্যবহার ও সত্তাগুলির সৃষ্টি ও অর্থনিরূপণ নির্দিষ্ট সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক সময়ের দ্বারা হয়। সেই অর্থে আমাদের লিঙ্গ পরিবর্তনশীল। আসলে, মানবসমাজে লিঙ্গভিত্তিক সংজ্ঞা ও মীমাংসা বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির মধ্যে থেকে উঠে আসে।

নারীবাদীদের মতে, আমাদের যৌনতা এবং লিঙ্গ সম্বন্ধীয় ধারণা সামাজিক সচেতনতা, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও অভ্যাসের ওপর নির্ভরশীল। এই ধরনের ধারণা প্রকৃতি (প্রবৃত্তি) ও সংস্কৃতির মধ্যে দ্বন্দ্বকে অবারিত করে। সামাজিক জীবনে লিঙ্গভিত্তিক সচেতনতা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। নারীবাদীদের মতে, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের জটিলতা আমাদের এই সরল সত্যটিকে বুঝতে বাধা দেয়। তাঁরা মনে করেন, এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক অস্তিত্ব তাদের ব্যবহারিক জীবনের আধার হয়।

মার্ক্সপন্থী নারীবাদীদের মতে, স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক সামাজিক কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল। এঁদের মতে, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্ককে শ্রেণী সম্পর্কের অনুরূপ ধারণায় বিচার করা হয়, যেখানে স্ত্রীরা অসাম্য ও শোষণের সম্মুখীন হয়। এই মতবাদ স্ত্রী-পুরুষের জৈবিক পার্থক্যের দরুন অসাম্যের অনিবার্যতাকে অস্বীকার করে। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সামাজিক প্রভেদের কারণ হল, এঁদের মতে, একের অপরের ওপর আধিপত্য। এই অসাম্য ও আধিপত্যকে চিরস্থায়ী করার জন্য সমাজে সৃষ্ট ও ব্যবহৃত হয়েছে লিঙ্গভিত্তিক প্রভেদ। এই লিঙ্গভিত্তিক অসাম্য স্ত্রী-পুরুষের জৈবিক পার্থক্যকে অধিক মাত্রায় গুরুত্ব দেয়, কিন্তু অন্য সামাজিক বিষয়গুলিকে এই ধারণা গুরুত্বহীন।

এর অপরদিকে, উত্তর-আধুনিক নারীবাদীদের মতানুযায়ী, সাংস্কৃতিক আচার-বিচারের ভিত্তিতে নির্মিত হয় স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য। আমাদের জীবনাচরণে যেহেতু আমরা স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে জৈবিক প্রভেদকে গুরুত্ব দিই এবং আমাদের প্রাত্যহিক জীবন লিঙ্গভেদের ওপর নির্ভরশীল, সেহেতু আমাদের অস্তিত্ব ও বিশ্বাস লিঙ্গভিত্তিক হয়ে পড়ে। অতএব এঁদের মতে, নারীত্বের পরিধি সমাজের ব্যবহারিক জীবনের ওপর নির্ভরশীল এবং অস্তিত্ব বৈচিত্র্যময় ও পরিবর্তনশীল।

অন্যান্য বিশ্লেষকদের মতে, বংশ এবং জাতিগোষ্ঠীগত বিষয়সমূহ এমন কিছু অভিজ্ঞতা এবং গুণগত পার্থক্য বয়ে আনে যা, যে কোনো লিঙ্গসম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, বয়স, যৌনসত্তা, অক্ষমতা, আর্থ-সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতার কাঠামো গড়ে তোলে। তাই সমাজে নারীদের প্রতি লিঙ্গ বৈষম্য ও আধিপত্যকে সরলীকৃত ভাবে দেখা উচিত নয়। বর্তমান সমাজে কিছু সংখ্যক নারীদের দেখা যায়, যারা তাদের গোষ্ঠী আনুগত্য, শ্রেণীগত অবস্থান ইত্যাদির দ্বারা কর্তৃত্ব বিস্তার করতে পেরেছে। তাই সময় এসেছে সচেতন হওয়ার যে, নারী বৈষম্যের ধারণাটি অভিন্ন নয়, তার মধ্যে নানারকম বৈচিত্র্য বর্তমান।

পূর্ববর্তী লিঙ্গ বৈষম্য নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনার অনেকগুলি কারণ আছে। যেমন আমরা বুঝতে পারলাম, লিঙ্গভেদ সামাজিক গোষ্ঠীগুলির কাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে। আমরা এও দেখলাম যে, যে কোনো ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠানে, তা সে গণমাধ্যমই হোক বা কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রই হোক, নারীরা নানাপ্রকার অসাম্য ও অবদমনের সম্মুখীন হয়।

১.৭ নারী বৈষম্য : সামাজিক ভিত্তি

অসংখ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, বিশেষ করে ভারতের মতো দেশে, প্রতিরোধক আইন থাকা সত্ত্বেও নারীদের প্রতি বিস্তর বৈষম্য বর্তমান। সামগ্রিক জীবনধারায়, যেমন, স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যক্ষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে, বা আবাসন, বা স্বাস্থ্য কিংবা সামাজিক পরিষেবার ক্ষেত্রে নারীরা চিরাচরিত বৈষম্য ও বঞ্চনার সম্মুখীন হয়ে থাকেন।

এই অংশের পর্যালোচনায় আমরা ভারতীয় সমাজে নারী বৈষম্যের বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করব। আমরা ভারতীয় সমাজে নারীদের মর্যাদার সেই সূচকগুলি দিয়ে শুরু করব, যেগুলি তাদের অধীনস্থ অবস্থানের নির্দেশক। এরপর আমরা এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার ভিত্তি ও সমাজে তা স্থায়িত্ব দেওয়ার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব।

আমাদের সমাজে যেমন একদিকে নারীদের দেবীরূপে পূজার্চনা করা হয়, অপরদিকে তাদের অস্তিত্ব ও মর্যাদার স্বাধীনতা দেওয়া হয় না। এই ধরনের বৈপরীত্য আমাদের সামাজিক কাঠামো, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে অন্তর্নিহিত। নারীদের সত্তা, স্বীকৃতি, স্বাধীনতা, সুযোগ-সুবিধা ও সম্প্রদায়ের ওপর অধিকার তাদের পরিবারের জাতি ও শ্রেণীমর্যাদার ওপর নির্ভরশীল। বৈবাহিক মর্যাদা ও সন্তান ধারণের ক্ষমতা বা মাতৃত্ব সমাজে নারীদের প্রতিষ্ঠার নির্ণায়ক। বিবাহিত নারীদের মান-মর্যাদার উন্নতি তখনই হয়, যখন সে (পুত্র) সন্তান জন্ম দিয়ে মাতৃত্বের প্রমাণ দিতে পারে।

সমাজ ও পরিবারের মধ্যে নারীদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শৈশবকাল থেকে ব্যক্তিত্ব গঠনে নানাবিধ নেতিবাচক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। এর ফলে তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও পরিচিতি সংকুচিত আকার লাভ করে। যদিও বর্তমান কালে আমরা বিবিধ ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করছি, যেমন, তাদের শিক্ষাক্ষেত্রে, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বা রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে; তবুও সামাজিক প্রাণী হিসেবে নারীদের যথাযথ মর্যাদা প্রাপ্তি ও ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে আমাদের এখনও অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে।

(ক) নারীদের প্রতি বৈষম্যের মনস্তাত্ত্বিক নির্দেশিকাগুলি :

কোনো জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য বুঝতে গেলে আমাদের যৌন অনুপাত, জন্মহার, মৃত্যুহার, জীবনকালের দৈর্ঘ্য— প্রভৃতি সূত্রগুলির বিশ্লেষণ করতে হয়। নারীদের ভারতীয় জনসংখ্যার অবস্থান বোঝার জন্য আমাদের মুখ্যতঃ যৌনহার ও মৃত্যুহার নিয়ে আলোচনা করতে হবে। যৌনহারের মাধ্যমে আমরা জনসংখ্যায় প্রতি এক হাজার পুরুষের অনুপাতে মহিলাদের সংখ্যা বুঝতে পারি। মৃত্যুহারের গণনা বার্ষিক হারে প্রতিটি বয়ঃগোষ্ঠীর প্রেক্ষিতে প্রতি হাজার জন্মের অনুপাতে করা হয়। আয়ুষ্কাল অর্থে জীবনের দৈর্ঘ্যকে বোঝায়, যেটি নির্ণয় করার জন্য প্রতিটি বয়ঃগোষ্ঠী অনুযায়ী আমাদের সমসাময়িক প্রচলিত মৃত্যুহার লক্ষ্য করতে হবে। অধ্যায় শেষে ভারতীয় সমাজের ক্ষেত্রে জনসংখ্যায় নারীদের বৈশিষ্ট্য সারণিবদ্ধভাবে উপস্থাপিত করা আছে। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও তা প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়।

(খ) সাক্ষরতার নিরিখে নারীদের প্রতি বৈষম্য :

শিক্ষা সামাজিক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিচার্য হয়ে থাকে। তা শুধুমাত্র ব্যক্তিত্ব বিকাশের

সহায়ক নয়, শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ আর্থিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে ও সামাজিক মর্যাদার ক্রমোন্নতিও ঘটতে পারে। সারণিবদ্ধ তথ্য লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বর্তমান সমাজে নারীরা উত্তরোত্তর শিক্ষিত হয়ে প্রায় সব ক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষা একটি অনন্য ভূমিকা পালন করে।

(গ) স্বাস্থ্য পরিবেশ ও নারী বৈষম্য :

বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালে লিপিবদ্ধ তথ্য থেকে দেখা যায় যে, নারী ও কন্যা সন্তানদের তুলনায় পুরুষ ও পুত্র সন্তানরা বেশি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সেবা পেয়ে থাকে। সাধারণত নারী ও কন্যা সন্তানদের ক্ষেত্রে রোগের বাড়াবাড়ি অবস্থায় না পৌঁছনো অবধি তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা মনে হয় না। উপরন্তু ভারতীয় সমাজে অধিকাংশ মেয়েরা রক্তাল্পতায় ভোগে। দৈনন্দিন জীবনে তাই গৃহস্থালীর বিভিন্ন কাজ করার জন্য তাদের অধিকতর শক্তি ক্ষয় হয়, কিন্তু সেই অনুপাতে খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা যায়। রান্নাঘরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ভারতীয় মহিলাদের স্বাস্থ্যহানির একটি বিশেষ কারণ। স্বাস্থ্যপ্রকল্প ও বিভিন্ন বীমা প্রকল্পে সেই সব নারীদের জন্য কোনরকম বন্দোবস্ত দেখতে পাই না যারা চাষ-আবাদ, খননকার্য, গৃহপালিত উৎপাদন ব্যবস্থা; যেমন, বিড়ি তৈরি করা, ঠোঙা তৈরি করা, সেলাইয়ের কাজ করা, মশলা তৈরি করা ইত্যাদি কার্যে লিপ্ত থাকে। ভারতীয় অর্থনীতিতে এই ধরনের উৎপাদনমূলক কাজের গুরুত্ব অপরিসীম এবং এর থেকে নানাবিধ বিপদের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও এগুলি সম্বন্ধে নীতি নির্ধারক প্রবন্ধকদের চূড়ান্ত ঔদাসীন্য লক্ষ্য করা যায়।

অপরদিকে পরিষেবা দানের ক্ষেত্রেও স্বাস্থ্যকর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গি নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক। অদ্ভুতভাবে দেখা যায়, একই রোগের ক্ষেত্রে যেখানে পুরুষদের প্রতি ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা যথেষ্ট সতর্ক, সংবেদনশীল ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করেন, সেখানে নারীদের ক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের আচরণের অভাব দেখতে পাই। উদাহরণ হিসেবে আমরা এডস্ (AIDS)-এর কথা বলতে পারি। নারীদের ক্ষেত্রে এডস্‌ের (AIDS) উপসর্গগুলি সম্পর্কে জনগণ, স্বাস্থ্যকর্মী বা জনস্বাস্থ্য প্রকল্পগুলিতে সচেতনতা বাড়াবার কোনো প্রচেষ্টা দেখা যায় নি। এডস্ (AIDS)-এর এই ধরনের পক্ষপাতপূর্ণ সচেতনতা রোগনির্ণয় ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে মারাত্মক বাধা সৃষ্টি করে, যা কি না নারী ও ও তাদের প্রিয়জনদের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষতিকর। সুরাসক্ত ও মাদকদ্রব্য সেবনকারীদের নিরাময়ের ক্ষেত্রেও আমরা একই ধরনের বৈষম্য লক্ষ্য করি, কারণ এই নিরাময় প্রকল্পগুলি পুরুষদের দ্বারা প্রবর্তিত ও পরিচালিত হয়। স্বাস্থ্য বীমার ক্ষেত্রে নারীদের প্রতি বঞ্চনার রূপটি সবচেয়ে প্রকট। এই ধরনের বীমায় যেখানে একদিকে দেখা যায়, পুরুষদের মধ্যে প্রচলিত রোগগুলি (উদাহরণ : ফুসফুসের ক্যান্সার) সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্ত, সেখানে নারীদের ক্ষেত্রে যে ধরনের বিশেষ উপসর্গ দেখা যায় (যেমন, ব্রেস্ট ক্যান্সার ও অন্যান্য স্ত্রীরোগ) সেগুলিকে পর্যাপ্ত হারে বীমার আওতায় আনা হয় না।

(ঘ) লিঙ্গ বৈষম্য ও কর্মসংস্থান :

কর্মক্ষেত্রে কর্মনিয়োগ লিঙ্গভিত্তিক। বর্তমান সময়ে আমরা নারীদের অধিকতর বিভিন্ন ধরনের চাকরি করতে দেখতে পাই, যা তাদের মাতৃত্বের দায় ও গৃহস্থালীর কাজকর্ম সামাল দিয়ে করতে হয়। তবু সমান অধিকারের নানাবিধ নিয়ম থাকা সত্ত্বেও নারীদের কর্মক্ষেত্রে মাত্র কিছু বিশেষ ধরনের কাজে নিয়োগ, অসমান মজুরি ও অসমান কর্ম সময়ের সম্মুখীন হতে হয়। নারীদের কর্মসংস্থানে ক্ষেত্রে আমরা আংশিক নিয়োগের হার বেশি দেখতে পাই। শ্রম বাজারে এই ধরনের বৈষম্যগুলিই শুধু লক্ষ্য করা যায় তা নয়, আমরা উল্লম্বন (vertical) এবং অনুভূমিক (horizontal) পৃথকীকরণও লক্ষ্য করি। স্ত্রী এবং পুরুষের কর্মনিয়োগ নির্দিষ্ট চাকরি ও কর্মসংস্থায় দেখা যায়। আবার, বিভিন্ন সংস্থায় পরিচালনার উপরিস্তরে শুধুমাত্র পুরুষের আধিপত্য সম্ভব হয়। কারণ পদোন্নতির ক্ষেত্রে নানাবিধ অবিধেয় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন

নারীদের হতে হয়। পেশায় সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্র পুরুষদের তুলনায় নারীদের জন্য বেশ সংকুচিত। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এরূপ ধারণা বর্তমান যে, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে পুরুষদের অপেক্ষা নারীদের কর্মদক্ষতার অভাব আছে, কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্তিমূলক। যোগ্যতা ও দক্ষতা কোনো অংশে কম না হয়েও নারীদের বঞ্চনার সম্মুখীন হতে হয়, যা কিনা পুরুষদের প্রতি সমাজের পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত। সাধারণত কোনো বিষয়ে কৃতকার্যতার ক্ষেত্রে, নারীদের ভাগ্য ও পুরুষদের সামর্থ্য উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে। এই ধরনের মানসিকতার জন্য কর্মক্ষেত্রে নারীদের সদর্থক বিচার বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষণ অপ্রয়োজনীয় ও অনাহূতের মর্যাদা পায়। অনুরূপভাবে, সম্পর্ক ও স্বার্থভিত্তিক যে গোষ্ঠীবদ্ধতা আমরা কর্মক্ষেত্রে দেখতে পাই তা থেকে বেশির ভাগ সময় নারীদের সচেতনভাবে পৃথক করে রাখা হয়। সবশেষে আমরা কর্মক্ষেত্রে নারীদের প্রতি অশালীন আচরণের উল্লেখ করতে পারি, যা সব ধরনের সংস্থা, এমনকি স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানেও দেখা যায়।

ভারতে নারীদের সামাজিক ভূমিকায় সবরকম গৃহস্থালীর কাজ করতে পারা অতি গুরুত্বপূর্ণ, যেগুলি সাধারণত 'শ্রম' বা 'শ্রমিকের' সংজ্ঞার আওতায় আসে না, কিন্তু এই গৃহস্থালীর কাজগুলিকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া হয় না। ১৯১১-এর আদম সুমারি অনুযায়ী ভারতে মেয়েদের মোট জনসংখ্যার ১৪.৪ শতাংশ শ্রমক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত। এর মধ্যে বেশির ভাগেরা চাষ-আবাদ ও খনন কার্যে নিযুক্ত। ১৯৭৬ (1976) সালের সমান পারিশ্রমিক আইন (Equal Remuneration Act) থাকা সত্ত্বেও, পারিশ্রমিক, পদ, দায়িত্ব, প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে নারীদের বঞ্চনার শিকার হতেই হয়। শহরাঞ্চলের চাকুরিজীবী মহিলাদের কিছু বাঁধাধরা পেশায় নিযুক্ত থাকতে দেখা যায়, যেমন শিক্ষিকা, নার্স, ডাক্তার, ক্লার্ক ও টাইপিস্ট। তবুও আজকাল আমরা মহিলাদের সাধারণত পুরুষকেন্দ্রিক পেশায়, যেমন, ইঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট, বিমান নির্মাণকারী, পুলিশ, পরিচালকবর্গের মধ্যে অনুপ্রবেশ দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সাংস্কৃতিক রক্ষণশীলতা ও বাধার জন্য তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করার ক্ষেত্রে দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে হয়।

(ঙ) লিঙ্গ বৈষম্য ও রাজনীতি :

বহু পশ্চিমী দেশের মতো ভারতবর্ষে নারীদের ভোটাধিকারের জন্য সংগ্রাম করতে হয়নি। স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর মতো নেতারা নারীদের প্রকাশ্যে যোগদান করতে আহ্বান করেছিলেন। ১৯৩২ (1932) সালে মহিলাদের ভোটাধিকার দেওয়া হয় ও ১৯৩৬ (1936) সালে তাঁরা স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত হন। সেই সময় থেকে ভারতীয় নারীরা রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত। স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধান পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে সমান অধিকারের স্বীকৃতি দেয়। যদিও আমরা কিছু সংখ্যক মহিলাদের এম. পি. (M.P.), এম. এল. এ (MLA), রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উপস্থিতি দেখতে পেয়েছি, তবুও অনুপাতের দৃষ্টিতে বিভিন্ন আইনসভায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব অতি নগণ্য। আসলে নির্বাচনের মতো রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় মহিলাদের নিষ্ক্রিয়তা ও পরিবারের পুরুষ সদস্যদের প্রভাব এর কারণ। যদিও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় ভারতীয় নারীরা পঞ্চায়েতে আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থার কল্যাণে স্থানীয় উন্নয়ন কার্যে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন, কিন্তু অনুরূপভাবে রাষ্ট্রীয় রাজ্যস্তরে তাদের সংরক্ষণের বিষয়টি বিতর্ক হিসেবে রয়ে গেছে। তাদের বাম, ডান ও মধ্যপন্থী সব রাজনৈতিক দলগুলির রাজনৈতিক ভাবে সঠিক প্রবচন শুনে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। সম্পূর্ণ ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব এই বিতর্কে উল্লম্ব ও অনুভূমিক ভাবে বিভক্ত। এমনকি যে রাজনৈতিক দলগুলির প্রধান মহিলা, তাদের পক্ষেও এই বিতর্কিত নীতি প্রয়োগ করার ক্ষমতা নেই। এমনকি চরমপন্থী দলগুলি যেগুলিকে আমরা বৌদ্ধিক ও মননশীলতার দিক থেকে সর্বাগ্রে মনে করি, তাদেরও পরিচালন সমিতিতে বা নেতৃত্বের বিভিন্ন স্তরে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব দেখা যায় না। স্বভাবতই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মহিলাদের স্থান উপান্তেই থেকে গেছে। স্বাধীনতার পর কোনো সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে শতাংশের বেশি মহিলা প্রতিনিধি রাষ্ট্রীয় আইনসভায় আসতে পারেননি, এবং তাদের অস্তিত্ব পুরুষদের তুলনায় প্রতীকীই থেকে গেছে।

১.৮ নারী বৈষম্য : প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি

আগের অংশে আলোচনার লক্ষ্য ছিল সমাজে নারীদের প্রতি যে বৈষম্য দেখা যায়, তার বিভিন্ন সূত্রগুলির বিশ্লেষণ; যেমন জনসংখ্যা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও রাজনীতির ক্ষেত্র। এটুকু নিশ্চয় পরিষ্কার হয়েছে যে, ভারতবর্ষে যে কোনো ব্যক্তির লিঙ্গ তার মর্যাদা, ভূমিকা ও সুযোগ-সুবিধা নির্ণয় করে। এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে, যদি আমরা নারী বৈষম্যের কাঠামোগত ভিত্তিগুলি না আলোচনা করি। কাঠামোগতভাবে অবস্থিত লিঙ্গ বৈষম্যের প্রকাশ পক্ষপাতপূর্ণ সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। তাই এই অংশে আমাদের উদ্দেশ্য ভারতীয় জাতিব্যবস্থা, পরিবার ব্যবস্থা, শ্রেণীকাঠামো ও সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করা ও কিভাবে এগুলি লিঙ্গ বৈষম্যকে চিরায়ত করছে, তা স্পষ্ট করা।

(ক) জাতি ব্যবস্থা : ভারতীয় সমাজে জাতিভিত্তিক স্তর বিন্যাস নারীদের অবদমনের প্রধান কারণ। এই অসাম্য আবার স্তরভিত্তিক জাতি ব্যবস্থাকে বজায় রাখতে সাহায্য করে। উঁচু জাতিদের মধ্যে নারীদের ভূমিকা অনেক বেশি সংকুচিত। যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে সমাজে আমরা যে লিঙ্গ বিভাজন দেখতে পাই, তা জাতি কাঠামোকে পুষ্টকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভারতীয় সমাজে গৃহস্থের ধর্মীয় ও আত্মিক পবিত্রতা রক্ষা করতে মুখ্যতঃ তিনটি আদর্শের কথা বলা হয়, নিরামিষ ভোজন করা, মদ্যপান থেকে বিরত থাকা ও স্ত্রীর আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা। নারীদের নিয়ন্ত্রণ করার দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়—(১) স্ত্রীদের স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং সেই সূত্রে তাদের ভূমিকা গৃহস্থালীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা, (২) সম্বন্ধ করে বিবাহ, শিশুকালে বিবাহ, একগামিতা ও বিবাহ বিচ্ছেদ অস্বীকার করে সমাজ স্ত্রীদের যৌনতা ও সত্তার ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টা করে।

এই ধরনের নীতির দৃঢ়তা উচ্চজাতির মধ্যে বেশ প্রচলিত ছিল, তার কারণ এগুলির সাহায্যে তারা তাদের জাতিগত পবিত্রতা রক্ষা করে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীগুলির ওপর তাদের আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠতার ধারণাকে চিরস্থায়ী করতে পারত। নীচু জাতিগুলি আবার এই ধরনের বৈষম্যমূলক নীতিগুলির আত্মীকরণ ও প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের পবিত্রতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হত। ফলত সম্পূর্ণ সমাজে নারীদের পক্ষে এই ধরনের নেতিবাচক নীতিগুলির দ্বারা পরিচালিত না হয়ে এর ঊর্ধ্বে ওঠা সম্ভব হত না। পিতৃতন্ত্র, পিতৃকুল ও পিতৃবাসস্থানিক ব্যবস্থা ও বিশ্বাস, যেগুলিকে ধর্মীয় গ্রন্থগুলি আবার বৈধতা দেয়, জাতি ব্যবস্থার আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক ভিত্তিকে পুষ্ট করে।

(খ) পরিবার ব্যবস্থা : সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিবার বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে সদস্যরা আত্মীয়তা, ভূমিকা ও উত্তর-দায়িত্বের (responsibility) ভিত্তিতে সম্পৃক্ত। পরিবার প্রজনন ও সামাজিকীকরণের একটি একক, যা ব্যক্তি মানুষকে সামাজিক করে তোলে। এই উপায়ে বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে পরম্পরা রক্ষা করা হয় ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্দিষ্ট করা যায়। পরিবারের প্রজনন ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত আছে বংশ পরিচয় ও ধর্মীয় মূল্যবোধ। বংশগতি দুধরনের হয়, পিতৃবংশানুক্রমিক ও মাতৃবংশানুক্রমিক। ভারতীয় সমাজে পিতৃবংশানুক্রমিক সমাজের সঙ্গে যুক্ত পিতৃবাসস্থানিক ব্যবস্থা, যেখানে স্ত্রীকে বিবাহের পর স্বামীগৃহে বসবাস করতে হয়। পিতৃবংশানুক্রমিক ও বাসস্থানিক ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করে যে, স্ত্রী বা কন্যা স্থাবর সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে না পায়। আইন এই ধরনের বৈষম্যকে অবৈধ ঘোষণা করার পরেও এখনও আমরা দেখি পরিবারের (পুরুষ) কর্তার কাছে আশা করা হয় যে, আগে থেকেই আইনানুগ ব্যবস্থা করে শুধু উত্তর-পুরুষদের হাতে স্থাবর সম্পত্তি দেওয়া হবে। স্ত্রীদের জন্য মাত্র গয়নার মতো সামান্য কিছু অস্থাবর সম্পত্তির ভাগ রাখা হয়, কিন্তু তা আবার পণপ্রথার মতো দুর্ভাগ্যজনক সমস্যা সৃষ্টি করে। আসলে এই ধরনের সামাজিক পরিণতি পিতা-মাতাকে কন্যা সন্তান জন্মালেই চিন্তাগ্রস্ত করে তোলে এবং তার ফলে শিশু কন্যার ব্যক্তিত্ব গঠনে নানাবিধ হীনম্মন্যতা ঢুকে যায়।

বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে পুত্র সন্তান অধিকতর কাম্য বলে নির্দেশিত হয়। পুণ্যার্থে পুরুষকে তার স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষা করে পুত্র সন্তান উৎপাদন করতে হবে যাতে বংশ রক্ষা হয়, পূর্বপুরুষদের শ্রাদ্ধ তর্পণ করা যায় ও পূর্বপুরুষরা মোক্ষ লাভ করে। এখানে স্ত্রীদের ভূমিকা শুধুমাত্র পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়া অবধি। এই ধরনের স্তর বিভক্তিকরণ, স্ত্রী এবং পুরুষদের মধ্যে, সন্তানদের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়। যে কারণে আমরা সমাজে ছেলেদের মেয়েদের তুলনায় খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্বাধীনতা, অধিকার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেতে দেখি। পরিবারের ঐক্যসাধন যেহেতু অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ, সেজন্য এই ধরনের বৈষম্যমূলক সামাজিক ব্যবস্থা দীর্ঘকাল থেকে স্থায়ী হয়ে গেছে। পরিবারে স্ত্রী-পুরুষের অভিজ্ঞতা ভিন্নতর হওয়ায় অসাম্য স্বাভাবিক বাস্তব হিসেবে গণ্য হয়।

(গ) সামাজিকীকরণ : সামাজিকীকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও আদর্শ, যার মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে লিঙ্গ বৈষম্য। সামাজিকীকরণ শিশুকাল থেকে পূর্ণবয়স্ক হওয়ার সময় পরিবার ছাড়াও বিভিন্ন মাধ্যমে হয়, যেমন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী, গণমাধ্যম এবং পেশাগত সংস্থা। কিন্তু সমাজে নারী-পুরুষ সামাজিকীকরণের অভিজ্ঞতা ভিন্নতর হওয়ার ফলে সামাজিক ভূমিকা ও আন্তঃসম্পর্কের ক্ষেত্রে অসাম্য বজায় থেকে যায়। পরিবারের মধ্যে পুত্র সন্তানদের সামাজিকীকরণ এমন ভাবে করা হয়, যাতে তারা বলবান, আত্মবিশ্বাসী ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়। অপরদিকে কন্যা সন্তানদের প্রথম থেকেই গৃহকর্মে নিপুণা ও মস্তিষ্কের বদলে দৈহিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে তৈরি করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই কন্যা সন্তানেদর স্বাধীন সত্তা ও আত্মসম্মানবোধ অনেকটাই হীনবল হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নরীদের মধ্যে সামাজিক বৈষম্যমূলক রীতিগুলির আচারনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠা দেয় এবং আনুষ্ঠানিক স্থায়িত্ব দেয়। প্রতিবেশী ও অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীগুলি নারীদের এই ধরনের রীতি ও প্রত্যাশিত ভূমিকা থেকে বিচ্যুত হতে দেয় না। গণমাধ্যমগুলি নারীদের চিরাচরিত রক্ষণশীল প্রতিরূপে উপস্থাপিত করে লিঙ্গ বৈষম্যকে সামাজিক চেতনায় স্বাভাবিক স্তরে নিয়ে আসে।

(ঘ) শ্রেণী কাঠামো ও পেশাভুক্ত নারী : মানব সমাজে শ্রেণী অর্থনৈতিক ভিত্তিতে বিবেচিত হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রেণীভিত্তিক স্তর বিন্যাস উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল। যেহেতু গ্রামাঞ্চলে আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষমতা ও জাতি কাঠামো পরস্পর সংযুক্ত, যা কিনা শ্রেণী কাঠামোতেও বর্তমান, তাই গ্রামাঞ্চলে নারীদের ওপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও উঁচু থেকে নীচু জাতিগত বিভেদ দেখা যায়। তুলনায় শহরাঞ্চলে আরোপিত মর্যাদা বেশি দৃষ্টিগোচর হয়, কারণ এখানে পেশা কৃষিভিত্তিক নয়। শহরের মধ্যে শ্রেণী গঠন মূলত উচ্চজাতির মানুষ করে। শিক্ষা ও কর্ম নিযুক্তির সাহায্যে এই শ্রেণীর মহিলারা গত একশো বছরে আপেক্ষিক ভাবে স্বাধীন ও মুক্ত হয়েছে, কিন্তু তারা এখনো অসচেতন ভাবে পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে গেছে। আসলে জাতি কাঠামোর মধ্যে অবস্থিত লিঙ্গভিত্তিক স্তর বিন্যাসের ওপরেই শ্রেণী কাঠামো গড়ে উঠেছে। পরিবারগুলি শ্রেণী কাঠামোয় নারী শিক্ষা ও কর্ম নিযুক্তিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, কিন্তু তা শুধুমাত্র সামাজিক মর্যাদা আহরণ করার জন্য। পরিবারের এই উপার্জনকারী নারীদের, সমাজ শিক্ষিত স্ত্রী, মা ও উপার্জনকারী সদস্যের ভূমিকা দিয়েছে মাত্র। 'পাত্র-পাত্রী চাই' বিজ্ঞাপনগুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, পরিবারগুলি নারী শিক্ষা ও উপার্জনের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এই ধরনের পরিবারগুলিতে নারী শিক্ষার ধরন, মান ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতার বিষয়ে সন্দেহ আছে। বস্তুত এই উপায়ে পরিবার নারীদের কর্মনিযুক্তির প্রকার ও স্তরকে নিয়ন্ত্রণ করে যাতে উপার্জনের পাশাপাশি তারা পরিবারের অভ্যন্তরে তাদের পরম্পরাগত ভূমিকা পালন করতে পারে।

(ঙ) আইন, নাগরিকত্ব ও রাষ্ট্র : যে কারণে আমরা এই পর্যায়ে রাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব, তা হল, গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে নীতিগতভাবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব তাদের নাগরিকদের ওপর বৈধ, তাই সচেতনভাবে তা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রযুক্ত হওয়া উচিত।

কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রয়োজন অনুযায়ী তারা নাগরিকদের স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব নেয়। কিন্তু সমাজে অবস্থিত লিঙ্গ বৈষম্যের ভাবধারা রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক ভূমিকা ও পরিষেবা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। যেহেতু রাষ্ট্র পরিবারগুলিকে

এক-একটি সুসংবদ্ধ একক হিসেবে দেখে, তার মধ্যেকার প্রভেদগুলিকে উপেক্ষা করে, সেহেতু আশা করা হয় যে পরিবারের মধ্যে সম্পদের সমান বণ্টন হবে। কিন্তু তা হয় না, কারণ প্রায় সবসময়ই নারীরা পুরুষদের ওপর নির্ভরশীল। উপরন্তু পরিবার, সম্প্রদায় ও বৃহত্তর সমাজে সেবা-যত্নের দায়িত্ব সাধারণত মহিলাদের ওপর থাকে, যার কোনো স্বীকৃতি না থাকায় সরকার সহজেই বৃদ্ধ, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধীদের প্রতি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়। এর ফলে সমাজে রীতিসিদ্ধ লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন আরও শক্তিশীল হয়ে ওঠে।

ঐতিহাসিক ভাবে যে নীতিগুলির ভিত্তিতে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রগুলি তাদের পরিকল্পনাগুলি নির্ধারণ করে সেগুলি প্রতিনিয়ত অকেজো হয়ে যাচ্ছে। আগে কল্যাণমূলক নীতিগুলি এই আশা করত যে সমাজে সব পুরুষ উপার্জনকারী হবে, অধিকাংশ নারী নিয়মিত চাকরি থেকে বিরত থাকবে এবং তারা স্বামীদের ওপর জীবন নির্বাহের জন্য নির্ভরশীল হবে। এর দ্বারা পরিবারের স্থায়িত্ব রক্ষা হবে। কিন্তু গত দশকেরও বেশি সময় থেকে আমরা লক্ষ্য করছি যে, বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, নারীরা উত্তরোত্তর নিয়মিত চাকরিতে যোগ দিচ্ছে, বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা বেড়ে যচ্ছে, স্বাভাবিকভাবেই 'এক-অভিভাবক' পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে যে সব মহিলা কল্যাণমূলক পরিষেবার দ্বারস্থ হয়, তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। উপরন্তু তাদের পরিবারে প্রথাগত ভূমিকা পালিত না হওয়ায় অবশ্যম্ভাবীভাবে মর্যাদাহানিও ঘটে থাকে।

আইনের চোখে নারীদের অধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও তার সংস্থাগুলি নারী বৈষম্য প্রতিকারের বিষয়ে অত্যন্ত শ্লথ ও উদাসীন, বেশির ভাগ আইন বস্তুত লিঙ্গ বোধহীন এবং লিঙ্গ বৈষম্য সম্পর্কে সংবেদনশীল নয়। তাই বারংবার নারীদের আইনী অধিকার ও সুরক্ষা লঙিঘত হয় ও তারা ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। নিয়ম প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমাজে পুরুষের স্থান, মযাদা ও ভূমিকা সর্বাগ্রে থাকে এবং নারীদের একান্ত নিজস্ব প্রয়োজনগুলি উপেক্ষিত থেকে যায়।

পরিসংখ্যানের দিকে নজর দিলে আজও আমরা দেখি, সমগ্র দেশে মুখ্য রাজনৈতিক ধারায় মহিলাদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের হার তুলনামূলকভাবে নগণ্য। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ লিঙ্গভিত্তিক নাগরিকত্ব। নাগরিক হিসাবে যে সব অধিকার ও দায়িত্ব রাষ্ট্র দেয়, তা নারীদের ক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে সমান নয়। বিভিন্ন গবেষণা প্রমাণ করে যে, সমাজে দুর্বল স্থানে থাকার দরুণ নারীদের নাগরিক হিসাবে নানাবিধ অধিকার ও দায়িত্ব অর্জন করার প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীর এবং এখনও কিছু কিছু বিষয়ে তারা একেবারেই বঞ্চিত।

উপরিলিখিত বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক বিষয়গুলির পুনর্মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে, সামগ্রিকভাবে নারীরা ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে এখনও বঞ্চিত। বহুল সংখ্যায় যৌন অত্যাচার, ধর্ষণ, নির্যাতন ও অশালীনতা প্রদর্শনের ঘটনাগুলি প্রমাণ করে, ভারতীয় সমাজে এখনও কিভাবে নারীদের ব্যক্তিসত্তা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং স্বাধীনতা খণ্ডিত হয়। আইন, কোর্ট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি খুব কম ক্ষেত্রেই নারীদের অধিকার ও স্বাধীনতার পর্যাপ্ত সুরক্ষা দিতে পারে। এখনও যখন মহিলাদের উপদেশ দেওয়া হয়, কী ধরনের বস্ত্র পরিধেয় বা কখন কোথায় যাওয়া উচিত, যাতে কিনা পুরুষদের কুনজরে না পড়ে। তার থেকে স্বভাবতই নারীদের নাগরিকত্বের প্রকৃতি ও পরিধি কিরূপ, তা সহজেই অনুমেয়। নাগরিক সমাজে নারীদের অবস্থানের অপর একটি প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে, তাদের পুরুষদের ওপর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা। 'অস্বীকৃত' গৃহকর্মে নারীদের শুধুমাত্র সময়, শ্রম ও শক্তি ব্যয় হয় তাই নয়, সামাজিক অর্থে তাদের নাগরিক সত্তার অবনমনও ঘটে। তাদের রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণও ব্যাহত হয়।

নারী বৈষম্যের বিভিন্ন রূপ, কারণ, প্রকৃতি ও প্রভাব আলোচনা করার পর এর পরের অংশে আমরা এই সমস্যা সমাধানের উপায়গুলি খুঁজতে চেষ্টা করব, বিধিবদ্ধ যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তার কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করব এবং নতুন উপায়গুলি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করব।

১.৯ সমাধানের উপায় ও মূল্যায়ন (বিধিব্যবস্থা)

গত তিন দশকে সরকারি ও বেসরকারি দুই স্তরেই নারী নির্যাতন ও বৈষম্য সম্পর্কে সচেতনতা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে ভারতবর্ষে, সরকারি নীতি গ্রহণের ফলে ও আত্মসচেতন নারী আন্দোলনের উদ্ভব হওয়ায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার হয়েছে।

ব্রিটিশ শাসনকালে রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিত্বদের প্রচেষ্টায় সমাজে নারীদের অবস্থানের বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয়। পরিণতিস্বরূপ ১৮৮৬ সাল থেকে ১৯৩৭-এর মধ্যে যে সব আইনি পরিবর্তন ঘটে, সেগুলি কিন্তু রক্ষণশীল ভারতীয় সামাজিক কাঠামোর মধ্য থেকেই হয়। জাতীয় স্তরের নেতারা নারী অধিকারকে স্বাধীনতা সংগ্রাম আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলে মনে করতেন। এই সময় নারীদের অনেকগুলি সংঘবদ্ধ আন্দোলনের প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাই। যেমন, উইমেন্স ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন (১৯১৭), ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ান উইমেন (১৯২৬), অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স (১৯২৭)।

স্বাধীন ভারতবর্ষে সংবিধান নীতিগতভাবে নারীদের সমান অধিকারের স্বীকৃতি দেয়। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে নারীদের উন্নয়মূলক কর্মসূচিগুলির মুখ্য লক্ষ্য ছিল তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিকাশের ব্যবস্থা করা। নারী আন্দোলনগুলিও এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড শুরু করে, তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেয় ও নারীদের সংগঠিত করে। এই আন্দোলনগুলি মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেন্দ্রিক ছিল। এবং এগুলি চালনার দায়িত্ব কর্মরত মহিলা ও সমাজসেবীদের হাতে ছিল। 'মানুষী' এই ধরনের প্রচেষ্টারই ফল। অবিরত আলোচনাচক্র, সম্মেলন ইত্যাদির সাহায্যে এই সংস্থাগুলি নারী সমস্যার বিভিন্ন দিক যেমন পরিবারের অভ্যন্তরীণ বৈষম্য, অর্থনৈতিক অবস্থান, কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ইত্যাদি বিষয়গুলি তুলে ধরেছে। নারী স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়নের জন্য নারীমুক্তি আন্দোলনগুলিকে প্রধানত আমরা চারটি রূপে সংগ্রাম করতে দেখি—

(ক) তাদের সংগঠিত ভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান চালাতে দেখি, যাতে নারীদের ব্যক্তিসত্তা বলিষ্ঠতর হয়, যৌন-স্বাধীনতা রক্ষা পায় ও সমাজ কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতার অংশীদারিত্ব বাড়ে।

(খ) তাদের আমরা শ্রমিক সংঘ গঠন করে নিজেদের কর্মক্ষেত্রে অবস্থান ও জীবনের মান উন্নয়ন করতে দেখি।

(গ) সংগঠিত ভাবে তারা গৃহস্থালীতে নারীদের প্রতি অবিচার, বৈষম্য, নিগ্রহ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে দেখা যাচ্ছে, যাতে লিঙ্গভিত্তিক আদর্শের পরিবর্তন করা যায়।

(ঘ) তাদের আমরা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখি।

বিভিন্ন কমিশন (যেমন, ন্যাশনাল কমিশন ফর উইমেন ১৯৯১), কমিটির (যেমন, কমিটি অন স্টেটাস অফ উইমেন ইন ইন্ডিয়া, ১৯৭৪) সুপারিশ এবং বিভিন্ন সমাজসেবামূলক ও নারীকল্যাণ সংস্থাগুলির অনবরত দাবির ফলে সাম্প্রতিক কালে আমরা কিছু পরিকল্পনার (যেমন, ন্যাশানাল পারস্পেকটিভ প্ল্যান ফর উইমেন, ১৯৮৮-২০০০) প্রণয়ন ও অন্যান্য কিছুর কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে সরকারকে দেখছি। নতুন আইন প্রণয়ন করে বা পুরনো আইনে পরিবর্তন এনে বহুবিবাহ, সতীদাহ, পণপ্রথা, ধর্ষণ, নারীদের বিবাহের নিম্নতম বয়স ইত্যাদি বিষয়গুলিকে প্রতিহত করার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। লাঞ্ছিত মহিলাদের ন্যায়ের নামে হেনস্থা হওয়া থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আইনের মধ্যে যে সব ত্রুটির ফাঁক, বিচ্যুতি ছিল সেগুলির সমাধানের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ধর্ষণ, অশালীন আচরণ ও প্রদর্শন এবং দেহব্যবসা রুখতে এখন প্রমাণের দায় অপরাধীর ওপরে আইন করে চাপানো হয়েছে। যদিও পরিস্থিতির আরও উন্নতি দরকার, তবুও সামাজিক নীতিবোধ ও বিবেক বিনষ্ট না হয়ে যায় তার দিকে আইন ও আদালত নজর দিচ্ছে। গত শতাব্দীর শেষের দিকে অনেকগুলি আন্দোলনের চাপে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়কারী পরীক্ষা এখন অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

১৯৭৩-এর ইক্যুয়াল রেমুনারেশান অ্যাক্ট পুরুষ এবং নারীর একই কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক এবং কর্মনিয়োগ ও পদোন্নতিতে সমান অধিকার সুনিশ্চিত করেছে। নারীদের কর্মসংস্থান ও উপার্জনের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে, যেমন, সুসংহত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচিতে ৩০ শতাংশ উপকৃত মহিলাদের হতে হবে। গ্রামাঞ্চলে নারীদের স্বনির্ভর করে তোলার জন্য ডেভেলপমেন্ট অফ উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন ইন রুরাল এরিয়াস নামে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। জহর রোজগারী যোজনার মতো কর্মসূচিতে ৩০ শতাংশের মতো কাজ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আছে।

এত সব হওয়া সত্ত্বেও নানাবিধ সমস্যা থেকেই গেছে। যেমন, শিশুকন্যা শ্রমিকদের শোষণ, কন্যাশিশুদের ধর্মার্থে দেবদাসী বা মাতাজী রূপে উৎসর্গ করা, পরিবার পরিজনদের দ্বারা যৌন নির্যাতন। উপযুক্ত আইনি, শিক্ষাগত বা আর্থ-সামাজিক সুযোগ যদিও এই ধরনের সমস্যা নিবারণ করতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের দিক থেকে সদিচ্ছার অভাবে আমরা পরিকল্পনা ও প্রণয়নের মধ্যে ফাঁক থেকে যেতে দেখছি। যেমন, ভারতবর্ষে সমরূপ ন্যায়-সংহিতা (ইউনিফর্ম সিভিল কোড) প্রণয়ন করার বিষয়ে গণতান্ত্রিক সরকারগুলি কখনোই সচেষ্ট হয়নি, পাছে কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ অসন্তুষ্ট হয়। আবার সমাজে বিভিন্ন অদৃশ্য বৈষম্য বর্তমান, যেগুলির শিকার নারী। পরম্পরাবদ্ধ ভারতীয় সমাজে এখনও শিক্ষাক্ষেত্রে, নিয়মিত কর্মক্ষেত্রে বা রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের প্রতি বঞ্চনা এখনও যে প্রতীয়মান তার একটি মুখ্য কারণ ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্গত অসংগতি। একাধারে সংবিধান সাম্য প্রতিষ্ঠার্থে জন্ম, কুল, ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ ইত্যাদি বিষয়গুলিকে অগ্রাহ্য করেছে, অপরদিকে ধর্মীয় স্বাধীনতা সুরক্ষিত করেছে। নারীদের সমান অধিকারের ক্ষেত্রে ধর্মীয় স্বাধীনতা একটি বিশাল বড় প্রতিবন্ধকতা। পারিবারিক ও ব্যক্তিগত আইনগুলি ধর্মীয় আদর্শনিষ্ঠ, যেগুলি আবার নারীদের সমান মর্যাদা ও অধিকার দেয় না। ফলত ধর্মীয় স্বাধীনতা নারীকে অবদমিত রাখতে আচার-আচরণের সাহায্য নেয়। বস্তুত আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ লিঙ্গভিত্তিক অসাম্যকে বজায় রাখে। লিঙ্গ সাম্য ও বিকাশের জন্য প্রয়োজন সচেতনতা ও কার্যকরী সামাজিক পদক্ষেপ। শুধু আইনের দ্বারা সমাজে সদর্থক কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য পারিবারিক কাঠামোকে আরও গণতান্ত্রিক করে তুলতে হবে, আর্থিক সম্পদের সমভাবে বণ্টন করতে হবে, নারীদের মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে হবে, তবেই বৈষম্যপূর্ণ সামাজিক কাঠামোয় পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে। যদিও রাজনীতি ও আইনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু জনগণের মূল্যবোধ ও বিশ্বাসে লিঙ্গভিত্তিক চেতনা রয়ে গেছে। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন তখনই সম্ভব, যখন নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা পাবে ও অর্তনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হবে। গত পঞ্চান্ন বছরে ভারতীয় অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি, যদিও সম্পত্তির ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই আইনের দ্বারা সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু মানসিকতার পরিবর্তনের অভাবে এখনও আইনের সাহায্যে (যেমন, উইল করে) মেয়েদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার প্রবণতা দেখা যায়। তাই আমরা বলতে পারি যে, আইন সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার দিকে প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টারও প্রয়োজন আছে। স্থাবর সম্পত্তির ওপর নারীদের বাধ্যতামূলক অধিকার, তাদের উৎপাদনকারী সম্পদের নিয়ন্ত্রণ দেবে। এর পাশাপাশি তাদের জন্য ঋণের ও উৎপাদন বর্ধক পরিষেবার ব্যবস্থা করতে হবে। দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি আরও কার্যকরী হবে যদি আমরা নারীদের জন্য পাবলিক সার্ভিস ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে পারি। ঋণ ও সঞ্চয় ব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে যদি নারীদের শিল্প-উদ্যোগে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় বা সমাজকল্যাণ কর্মসূচিতে মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া বা নিয়োগ করা যায় বা শিশু শিক্ষা ক্ষেত্রে মহিলাদের নিয়োগ করা যায় কিংবা তাদের জন্য নিজস্ব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে সমাজে অনেকটাই সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে ও নারীদের প্রতি বৈষম্য দূর করা যাবে।

সমাজ থেকে নারী বৈষম্য দূর করতে পারলে মানব সভ্যতা ব্যাপক সুফল লাভ করবে, কারণ তবেই আমরা একটি মানবাধিকার পুষ্ট সংস্কৃতি স্থাপন করতে পারব, যা সামগ্রিকভাবে মানব সম্পদের মান উন্নয়ন করে সাধারণ জীবনের গুণমান বলিষ্ঠতর করবে।

১.১০ সারাংশ

এই এককে আমরা উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছি যে, সমাজে কি ধরনের লিঙ্গভিত্তিক প্রভেদ আছে, যা পুরুষ ও নারীর মধ্যের আন্তঃসম্পর্ককে বৈষম্যমূলক করে তুলেছে। অধ্যায়ের শুরুতে আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম, সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষিত ও পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে—যা নারী নির্যাতন ও বৈষম্যগুলির সামাজিক ভিত্তিগুলিকে বোঝার প্রক্রিয়ায় সাহায্য করেছে। যেহেতু লিঙ্গ সচেতনতা সমগ্র সমাজে বিস্তীর্ণ ভাবে বিদ্যমান, এর প্রতিক্রিয়া আমরা জীবনের সর্বপ্রকার ক্রিয়াকর্মে লক্ষ্য করি। ফলত আমরা বিশদে আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি, লিঙ্গভিত্তিক নানাপ্রকার অত্যাচার, নির্যাতন ও বৈষম্যের রূপ। তার পাশাপাশি আমরা বুঝতে চেষ্টা করেছি, পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যগত আদর্শের সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি। পরিশেষে আমরা বিশ্লেষণ করেছি, কিভাবে লিঙ্গ বৈষম্যকে প্রতিহত করা যায়, কি ধরনের পরিকল্পনার মাধ্যমে সমগ্র নারী সমাজের সুরাহা হতে পারে, তাদের জন্য ন্যায় ও মর্যাদা কিভাবে নিশ্চিত করা যেতে পারে এবং তাদের ক্ষমতায়ন ও স্বাধীনতার প্রক্রিয়া কি ধরনের বাধা ও প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে পারে।

১.১১ প্রশ্নাবলী

(ক) দীর্ঘ প্রশ্ন ঃ-

(১) নারীদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতনের সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বগুলি বিশ্লেষণ করুন।
(২) মানব সমাজে নারী বৈষম্যের বিভিন্ন রূপের সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বগুলি বিশ্লেষণ মূল্যায়ন করুন।
(৩) কি ভাবে ধর্ষণ ও অন্যান্য যৌন নির্যাতন নারী স্বাধীনতাকে খণ্ডিত করেএবং সমাজ তাদের দুর্বল ও নির্ভরশীল প্রতিচ্ছবি প্রতিষ্ঠা করে, তা দেখান।
(৪) সমাজে নারীর অবদমিত স্থানের বিভিন্ন সূত্রগুলি বিশ্লেষণ করুন।
(৫) সমাজে লিঙ্গ বৈষম্যকে স্থায়িত্ব দেয় এমন প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিগুলি কী?
(৬) সমাজে নারীদের প্রতি বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার, হিংস্রতা ও নির্যাতনের বর্ণনা দিন ও অসম লিঙ্গ সম্পর্ককে বজায় রাখতে এদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।
(৭) বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে কি আপনার মনে হয় সমাজে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টা অপূর্ণই থেকে গেছে?

(খ) মধ্যম প্রশ্ন ঃ-

(১) রাষ্ট্র, আইন ও নাগরিকত্ব নারীদের কী ধরনের প্রতিরূপ নির্মাণ করে?
(২) যৌনতা ও নির্যাতনের সাহায্যে লিঙ্গ ভিত্তিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার নারীবাদী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করুন।
(৩) বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার জন্য সমাজে নারীর জীবনের মান কীভাবে প্রভাবিত হয়?
(৪) ভারতীয় সমাজে নারীর মর্যাদা উন্নয়নে আইনের ভূমিকা উল্লেখ করুন।
(৫) নারী বৈষম্যের শিকড় কি পরিবার প্রথায় অন্তর্নিহিত আছে?
(৬) স্ত্রী-পুরুষ আন্তঃসম্পর্ক নির্মাণে জাতি-ব্যবস্থার ভূমিকার মূল্যায়ন করুন।

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ-

(১) নারীদের সমাজে নিম্ন মর্যাদার জন্য কী ধরনের কুফল আমরা লক্ষ্য করি?
(২) ভারতীয় সংবিধানে কী ধরনের বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায় যা নারী স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে?

(৩) ভারতীয় সংবিধানে কী এমন কোনও পরস্পর বিরোধ আছে যা লিঙ্গ বৈষম্যকে আরও শক্তিশালী করে?

(৪) নেতৃত্বকারী জাতিগোষ্ঠী এবং সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে নারী নির্যাতনের অভিজ্ঞতা ভিন্ন প্রকৃতির কেন হয়?

(৫) পরিবারের অভ্যন্তরে নির্যাতনের ক্ষেত্রে বিধবাদের অভিজ্ঞতা কিরূপ হয়?

(৬) যৌন উত্তেজনা বর্ধক নারীদেহ প্রদর্শন (Pornography) কে কী সমাজে মহিলাদের শোষণের সর্বোৎকৃষ্ট রূপ হিসাবে দেখা যেতে পারে?

(৭) ভারতীয় জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি কি সমাজে নারী বৈষম্য নির্দেশ করে?

(৮) শ্রেণী কাঠামো সমাজে নারী স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে?

(৯) ভারতীয় সমাজে পণপ্রথা ও ভ্রূণহত্যার মধ্যে কি কোনও পারস্পরিক সম্পর্ক আছে?

১.১২ গ্রন্থপঞ্জী

1. Abbott, P. and Wallace, C. 1996, IInd Ed., *An Introduction to Sociology: Feminist Perspectives,* London : Routledge.
2. Ahuja, Ram. 1997, IInd Ed., *Social Problems in India,* Jaipur : Rawat.
3. Desai, Neera and M. Krishnaraj. (edts.), 1987, *Women and Society in India,* Delhi : Ajanta Publications.
4. Dube, S.C. 1990, *Indian Society,* New Delhi : NBT.
5. Landrine, H. and E.A. Klonoff, 1997, *Discrimination Against Women, Prevalence, Consequences, Remedies, Thousand Oaks :* Sage.
6. Mathews, R. and J. Young (edts.) 1986, *Confronting Crime,* London : Sage.
7. Pandey, R. 1994, *Social Problems of Contemporary India,* New Delhi : Ashish Publishing House.
8. Smart, Carol & Bren Neale, 1999, *Family Fragments?* Cambridge : Polity Press.
9. World Development Report 2000/2001. *Attacking Poverty,* New York : OUP.

১.১৩ পরিসংখ্যান

The Following Informations Indicate that Women in Indian Society, Compared to Their Male Counterparts, Face Inequality and Deprivation in Every Aspect of Their Life.

1. Life Expectancy at Birth (1993-97)	*61.1 Years.*
2. Total Fertility Rate (2000)	*3.3*
3. Percentage of Pregnant Women (2000)	
(a) Had Antenatal Check Up	*61.8%*
(b) Blood Pressure Measured	*43.8%*

(c) Given TT Injections — *60.2%*

(d) Received IFA tablets — *53.8%*

(e) Delivered at Institutions — *34.5%*

(f) Delivery attended by health professional — *42.5%*

(g) Pregnancy or pregnancy related deaths PA — *100000 Approx.*

4. Anemia amongst Women (15-49 yeas) — *51.8%*

5. India (2000)	Total population	Child Population	% of total
(a) Sex Ratio	*933*	*927*	—
(b) Missing Women	*35595564*	*5979506*	*16.8%*

6. Maternal Mortality Ratio (1999) — *540 per 1 lac live birth.*

Throughout childhood the mortality rate among girls continue to be 20% higher than among boys.

7. Literacy Rate, Females as a percentage of Males (2001) — *71.4%*

8. Enrollment ratio, girls as a percentage of boys (1999-2000)

Primary — *82.2%*

Secondary — *75.2%*

9. Percent ever Married Women (1999)

(a) Needs permission to visit friends/relatives — *75.6%*

(b) Beaten or physically mistreated since age 15 — *21.0%*

10. Literacy Rate (2001)		No. of Illiterates.
(a) Total	*65.38% (562010743)*	*296208952*
(b) Male	*75.85% (336969695)*	*106654066*
(c) Female	*54.16% (225041048)*	*189554886*

Despite significant expansion of early education services, nearly two in every three women and one in every three men are illiterate.

11. Gross Enrollment Ratio (1999-2000)

(a) Primary

i. Boys — *100.9%*

ii. Girls — *82.9%*

(b) Secondary

i. Boys — *65.3%*

ii. Girls — *49.1%*

(c) University/College (1997-98) in Lacs

i. Boys — *35.2*

ii. Girls — *21.3*

12. Estimated number of women and child victims of commercial sex exploitation in six metropolitan cities (1999)	*100000*
13. Inducted into commercial sex exploitation when they were less than 18 years of age (1999)	*40%*
14. Track Record of Women Candidates in first 12 Lok Sabha Elections :	
1st	*22 (4.29%)*
2nd	*27 (5.4%)*
3rd	*34 (6.7%)*
4th	*31 (5.9%)*
5th (Mrs. Gandhi at the peak of her career as PM)	*22 (4.29%)*
6th (Decline during Janata Party in power)	*17 (3.4%)*
7th	*28 (5.1%)*
8th (During Rajiv Gandhi's regime)	*44 (8.11%)*
9th	*28 (5.29%)*
10th	*39 (7.2%)*
11th	*39 (7.2%)*
12th	*43 (7.79%)*
15. A Sakshi Survey of 2400 men and women across organizations and institutions, 2002, regarding ''Sexual Harassment at Workplace''	
(a) Sexual Harassment exists at my Workplace	*80%*
(b) I have encountered it	*49%*
(c) I have not heard of the 1997 SCI judgement	*58%*
(d) My Office follows the SCI guidelines	*20%*
(e) Men are responsible for it	*28%*
(f) Women are responsible for it	*08%*
(g) The only to stop it is by protesting	*80%*
(h) Women who get it, deserve it	*12%*
(i) Sometimes women succumb because it advances their careers	*32%*
(j) Bosses are to blamed	*68%*
(Pub : The Telegraph, Calcutta, 10 November, 2002)	
16. According to the 1991 census, the ratio of Working Males to total male population was	*51.55%*
Whereas the ratio of Female Workers to total female population was,	*22.25%*
i.e. in actual figures :	
(a) Male	*22.64 Crores*
(b) Females	*09.06 Crores*

Source : UNICEF IN INDIA 1999-2002, if not otherwise mentioned